বাঙ্গালা সাহিত্য।

জেলা বর্দ্ধমান রায়না হইতে
শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
প্রণীত
ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
আর্য্যবন্ধু প্রেস।
সন ১২৯২ সাল।

১৩২ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্—আর্য্যবন্ধু যন্ত্রে
শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।
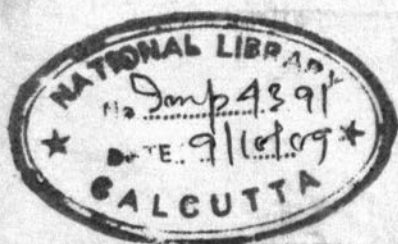
উৎসর্গ পত্র।

অভিন্ন হৃদয়

শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ বিশ্বাস

মহাশয়ের

কর-কমলে

অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ

এই গ্রন্থ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত

হইল।

অবতরণিকা।

আমি অনেক দিন হইতে বঙ্গীয় সাহিত্যালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার আলোচনে যতই অগ্রসর হইয়াছি ততই ইহার মধ্যে নানাবিধ নূতন দ্রব্য আমার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে; যতই প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছি ততই নূতন নূতন গ্রন্থকার দেখা দিয়াছেন; সাহিত্যালোচনের সময় আমার এক দিন মনে হইল বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিলে ভাল হয়; এ সম্বন্ধে যদিও দুই একখানি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কিন্তু তাহা এ পক্ষে যথেষ্ট নহে; এবং তত্তৎ গ্রন্থকার মহাশয়-গণও সম্মুখে যাহা পাইয়াছেন তাহাই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; ভাষার অভ্যন্তরে কেহই প্রবেশ করেন নাই; এবং কেহই ভাষার উন্নতির ক্রম প্রদর্শন করিতে যত্নবান হন নাই; জাতীয় সাহিত্যের সহিত জাতীয় বিকাশের যে সম্পর্ক আছে, ইহা তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পান নাই; আমি জাতীয় বিকাশের সহিত জাতীয় সাহিত্যের সম্বন্ধ ও সেইরূপে বাঙ্গালার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির বিষয় ইহাতে সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছি; এই নূতন প্রকার বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনে কৃতকার্য্য হইলাম কি না বলিতে পারি না। আমি যে বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখি

য়াছি, তাহার প্রথম খণ্ড অদ্য পাঠক সমক্ষে উপস্থাপিত করি-
লাম; উৎসাহ পাইলে অচিরে ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত
হইবে।

রায়না
১লা বৈশাখ
১২৯২।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

বাঙ্গালা সাহিত্য।

"If there is any thing in this world which, next after the flag of his country or its spotless honour, should be holy in the eyes of a young man, it is the language of his country. He should spend at least the third part of his life in cultivating its resources".

Thomas De Quincey.

আমরা যে এই ধন ধান্য সুশোভিত, সুন্দর লতাপাদপে সমলঙ্কৃত, পুণ্যসলিলা নদীনিচয় প্রধাবিত বঙ্গদেশে বসবাস করিতেছি, পূর্ব্বকালে ইহা উত্তাল তরঙ্গমালা পরিপ্লুত—নানাবিধ হিংস্র জলজন্তুসঙ্কুল মহাসমুদ্রের কুক্ষিগত ছিল; কত দিনে সেই ভীতিবিধায়ক মহাসমুদ্র মনুষ্যের আবাসস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহার কোন বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অধুনাতন প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ইহার স্থান বিশেষের নিম্নদেশস্থিত মৃত্তিকা ও স্তর সন্দর্শনে প্রমান করিয়াছেন যে, কোন না কোন সময়ে এই বঙ্গদেশের উপর দিয়া মহাসাগরের ভীষণ তরঙ্গনিচয় সঞ্চালিত হইত; তখন প্রকৃতিদেবীর এই সাধের বিলাসক্ষেত্র নক্রমকরের আবাসস্থল ছিল; কিন্তু কতদিনে ছিল, তাহার সুন্দর মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয় নাই,—হওয়া সম্ভবপরও

নহে। তবে এইমাত্র জানিতে পারা যায়, যে যৎকালে মাননী আর্য্যগণ তাঁহাদের স্মৃতিকা গৃহ পরিত্যাগকরতঃ অভ্রংলিঃ হিমালয় ও হিন্দুকুশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ধন ধান্যপূর্ণ উর্ব্বর ভারত ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তখন বঙ্গদেশ মহাসমুদ্রের এক অং মধ্যে পরিগণিত ছিল; তাঁহারা যখন ভারতের আদি অধিবাসীদিগকে বিদূরিত করিয়া দিয়া উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল অধিকারপূর্ব্বক ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছিলেন, তখনও ইন্দিরালয় রত্নাকর নানা বিধ রত্ন ইহার উপরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন; কেননা দেখিতে পাই যৎকালে অমৃতের জন্য দেব ও দিতি সুতগণএকত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন তৎ-কালে তাঁহারা মন্দর ভূধরকেই মন্থন দণ্ডরূপে গ্রহণ করেন; প্রমাণীকৃত হইয়াছে, মন্দরভূধর রাজমহলের কোন শৈলের শৃঙ্গ বিশেষ। ইহা হইতেই বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে মহাসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গমালা রাজমহলেরই পাদদেশ-স্থিত বেলাভূমিতে প্রতিহত হইত; কিন্তু কতদিনে ইহা এইরূপ মনুষ্য আবাসে পরিণত হইয়াছে তাহার কোন সুন্দর প্রমাণ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক বঙ্গদেশ উৎপত্তির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি না? পরিবর্ত্তনই এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম; প্রতি-দিনে—প্রতিমুহূর্ত্তে—প্রতিদণ্ডে এই পরিদৃশ্যমান বিশাল জগ-তের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিলে ইহার অন্যথা কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না; যে বিষয়েই অনুসন্ধান করনা তাহাতেই এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রত্যক্ষীভূত হইবে; এমন কি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যেস্থান সম্পূর্ণ পরিচিত ছিল, অদ্য সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে নূতন বলিয়া বোধ হয়; দশ

বৎসর পূর্ব্বে যে শিশু দর্শন করিয়াছি—এক্ষণে সে শিশু আর তেমন নাই—দেখিলে চিনিবার কোন উপায় নাই—সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন প্রতি সপ্তবৎসরে মনুষ্যদেহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়; সাতবৎসর পূর্ব্বে একজন যেমন ছিল আজ সে আর তেমন নাই, আবার আজ যাহা আছে আগামী সাতবৎসরে তাহার আর কিছুই থাকিবে না; মনুষ্যদেহ ক্রমিক পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এই জড়-জগৎও সেইরূপ ক্রমিক বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়া নিত্য নূতন ভাবে সমুদিত হইতেছে। অদ্য যেস্থল প্রকৃতিদেবীর রম্য-বিলাসকানন—কল্য তাহা তাঁহার বিভিন্নভাবদ্যোতক বিস্তৃত জলক্রীড়ার রঙ্গভূমি; যে বালুকাপূর্ণ—পথিকের প্রাণসংশয়কর সাহারা, এক্ষণে প্রাণীশূন্য—তৃণশূন্য হইয়া দিগন্তব্যাপী মরু-ক্ষেত্ররূপে সকলের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতেছে, তাহা পূর্ব্বে নানাবিধ প্রাণীসঙ্কুল—উত্তাল তরঙ্গমালা পরিপ্লুত মহাসমুদ্রের অন্তর্গত ছিল;—মহীধররাজ হিমাদ্রি ও তদুপরিস্থিত ভূধরশৃঙ্গাগ্রগণ্য গৌরীশঙ্কর এক সময়ে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের কুক্ষিগত ছিল বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এইরূপে যাহাই দেখ তাহাতেই দেখিতে পাইবে সমুদায়ই এই পরিবর্ত্তনের অধীন। ভীম বেগশালিনী পদ্মার তীরে যাইয়া দেখ, তৎকুলস্থ যেস্থান অদ্য ধনধান্যসঙ্কুল উর্ব্বরক্ষেত্র, কল্য তাহা নদীর আয়তন বর্দ্ধিত করিতেছে;—আবার অদ্য যাহার উপর দিয়া—নাবিক নিচয় শঙ্কিতচিত্তে গমনাগমন করিতেছে, কল্য সেখানে পঞ্চমবর্ষীয় বালকও অবলীলাক্রমে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; বঙ্গ সাগরোপকূলেও এ প্রকার পরিবর্ত্তন সদতই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বজনীন নিয়ম প্রভাবেই বঙ্গদেশের জন্ম;

পূর্ব্বে বলিয়াছি বৈদিক সময়ে বঙ্গভূমির অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু মন্বাদি সংহিতাকারগণের সময়ে, ইহা দেশরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু তখনও ইহা মনুষ্যের আবাস যোগ্য হয় নাই, এবং সেই জন্যই ভগবান্ মনু তীর্থ দর্শন উদ্দেশ্য ভিন্ন বঙ্গদেশে আগমন নিষেধ করিয়াছেন (১)। মহর্ষি বাল্মিকীর সময়ে ইহার কোন কোন অংশ বাসস্থল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; কিন্তু তখনও ইহার অধিকাংশ স্থলই জঙ্গলময় ছিল, আর্য্যগণ সেই শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইয়া ইহার স্থানে স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন; ফলতঃ তখন বঙ্গদেশে আগমন করিলে আর প্রায়শ্চিত্য করিতে হইত না; তৎকালে ইহা পুণ্যতোয়া ভাগিরথী স্পর্শে পূত হইয়া গিয়াছে; আমরা সেই জন্যই দেখিতে পাই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সময় ইহা আর্য্যসঙ্কুল একটী সুবৃহৎ রাজ্য—সমুদ্রসেন প্রভৃতি আর্য্যবংশীয় নরপতিগণ ইহার স্বামী। দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত পাণ্ডবগণ ইহার উপর দিয়া ত্রিপুরা—হেরম্ব পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন; উর্ব্বর বঙ্গদেশের আধিপত্য পাইবার জন্য তাঁহারাও চেষ্টা করিয়াছেন; সুতরাং মহাভারতের সময়ে যে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে বাসযোগ্য ও একটী বিস্তৃত রাজ্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী পুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সেই পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গদেশ একটী প্রবল রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এইস্থানে একটী কথা

---

(১) তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছেৎ পুনঃসংস্কার মর্হতি।

মনুসংহিতা।

বলিয়া রাখা আবশ্যক ; আমরা এক্ষণে বঙ্গদেশ বলিলে যে দেশ বুঝি ; পূর্ব্বকালে তাহাকে বঙ্গদেশ বলিত না। অধুনা আমরা যাহাকে বাঙ্গলাদেশ বলি, পূর্ব্বকালে তাহা বঙ্গ, গৌড়, পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বল্লালসেনের রাজত্ব সময়েও ইহার সমুদায় অংশকে বঙ্গদেশ বলা হইত না ; তাঁহার সময়ে ইহা রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, মিথিলা, বাগড়ী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞায় আখ্যাত হইত। মুসলমানগণের রাজত্ব সময়েই "বাঙ্গালা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। আইন আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল বলেন বঙ্গদেশীয় নরপতিগণ জলপ্লাবন হইতে নিম্নপ্রদেশ সকল রক্ষা করিবার নিমিত্ত দশহস্ত উচ্চ ও বিংশতি হস্ত প্রশস্ত এক একটি আল বা বাঁধ দিতেন ; তাহাতেই বঙ্গ ও আল এই দুই শব্দের যোগে "বঙ্গাল" বা "বাঙ্গালা" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা সমসুদ্দীন অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন ; তিনি গৌড় প্রভৃতি অন্যান্য জনপদ সকল স্বীয় করায়ত্ত করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন ; তাঁহার সময়েই (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে) এই দেশের প্রথম বাঙ্গালাদেশ নাম-করণ হয়। তদনন্তর যৎকালে বাদসাহ কুলতিলক আকবরসাহ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিয়া ইহাকে অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত করেন তৎকালে তিনি সেই "বাঙ্গালা" নামই প্রবল রাখিয়াছিলেন। তদবধিই বঙ্গভূমি "বাঙ্গালাদেশ" নামে (২) অভিহিত হইয়া আসিতেছে ; ও ইহার ভাষা বাঙ্গা-

---

(২) Vide preface to the "Bengali Grammar" by Babu Krishno Kishore Bannerji.

লাভাষা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বোধ হয় স্থান ভেদে হাইক কেহ "গৌড়ীয় ভাষা" কেহ বা "বঙ্গীয়ভাষা" বলিত। আকবর সাহেব রাজ্যারম্ভের বহু পূর্ব্বেই "বঙ্গীয়ভাষা" জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং ভাষাটি নিতান্ত সামান্য দিনের নহে। আমরা প্রমাণ করিব প্রায় সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাভাষা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু ভাষার ইতিহাস দূরে থাকুক, ভারতের কোন ইতিহাস গ্রন্থই পাওয়া যায় না; সুতরাং অন্ধকার মধ্যে কোনরূপে প্রকৃত রাস্তা ধরিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সাতশত বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষায় স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন ও তদবধি যে ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন আমরা সেই ভাষার আলোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমরা ক্রমশঃ ইহার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিব।

প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে অধুনাতন সুসভ্য জাতিগণ কোন সময়ে কোন এক স্থানে এক পরিবার ভুক্ত ছিলেন; তখন হিন্দু-পারসিক, গ্রীক-রোমক, জর্ম্মন-ইংরাজ প্রভৃতি কোন ভিন্ন ভেদই ছিল না; তখন সকলেই এক কর্ত্তৃত্বাধীন ও এক ভাষা ভাষী ছিলেন। আর্য্যগণের সেই সূতিকা গৃহে যখন সকলেই নিরাপদে স্বচ্ছন্দ মনে বনের ফল মূল আহরণ, পশুপালন ও কৃষি উৎপন্ন সামান্য আহারীয় দ্বারা সুখে দিন যাপন করিতেন তখন তাঁহাদের মধ্যে কি ভাষা প্রচলিত ছিল তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে গ্রীক্, লাটিন, জেন্দ, সংস্কৃত প্রভৃতি সুন্দর ভাষা সকলের মধ্যে পরস্পর নানা শব্দের একতা ও

ব্যাকরণ গত অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন, যে পূর্ব্বে এই সকলেরই মূল একটি ভাষা ছিল; পরে কাল ক্রমে সেই একই ভাষা ভাষীগণ পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে তাঁহাদের সেই মধুস্রাবী একই ভাষা দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল; এবং ক্রমে এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আর সহজে তাহাদিগকে এক মূলীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইয়ুরোপীয়গণের পিতৃপুরুষগণ প্রথমেই স্বস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন; পরে হিন্দু ও পারসীকগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ তাঁহাদের সূতিকাগৃহ পরিত্যাগ করতঃ একদল অভ্রংলিহ হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের তুষার ধবল শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সপ্তনদী প্রধাবিত উর্ব্বর সপ্তসিন্ধু প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, ও অপর দল ইরানে প্রবিষ্ট হইয়া জোরাস্তার ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের পিতৃ পুরুষ যৎকালে প্রথম ভারতক্ষেত্রে পদার্পন করেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের উপাসনা করিতেছেন সেই দিন হইতেই বেদ ঈশ্বর প্রদত্ত, অপৌরুষেয় ইত্যাদি শব্দে তাহার প্রাধান্য খ্যাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সেই দিন হইতেই বেদের গৌরব আরম্ভ হইয়াছে—ইহা সকলেরই আলোচ্য হইয়াছে।

বৈদিক সময়ে আর্য্যগণের জাতীর জীবন সেই অল্পে অল্পে বিকাশ পাইতেছে, সামাজিক রীতি নীতি সেই প্রস্ফুটিত হইতেছে মাত্র; তখন তাঁহাদের সমাজ সদ্যমথিত নবনীতবৎ কোমল, প্রস্তরবৎ কঠিন হয় নাই; আর্য্যগণ তখন সরল প্রকৃতিক, উদার হৃদয়, অল্পে সন্তুষ্ট শিশুর ন্যায়; কোন প্রকার কৃত্রিমতা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই, বিদ্বেষ বিষ তাঁহাদের

কোমল হৃদয়কে জর্জ্জরীভূত করে নাই; সকল মনুষ্যেই সমান বিশ্বাস; তাঁহারা তখন শিশুর ন্যায় দর্পনস্থিত চন্দ্র ধরিয়াই সন্তুষ্ট। বেদ এই রূপ সরল প্রকৃতিক আর্য্যগণের হৃদয়ের মধুর উচ্ছ্বাস। বেদই সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্য; জাতীয় সাহিত্য, জাতিয় হৃদয়ের সুন্দর চিত্রপট। ইতিহাস প্রায়ই বাহিরের কথা প্রকাশ করে—জাতীয় সাহিত্য অন্তরের অন্তরতম ভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া দেয়। মানব মন যখন যে ভাবে আক্রান্ত থাকে, সে দেশীয় সাহিত্যও তখন সেই সেই ভাবেই সুরঞ্জিত দেখাযায়; মনুষ্য যৎকালে আহ্লাদের তরঙ্গে দিগ্ বলয় প্রতিধ্বনিত করেন, তাৎকালিকী সাহিত্যও তখন সেই হাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদে ঢল ঢল করিতে থাকে; যখন জাতীয় হৃদয় দিগ্বিজয়ের অনুপম আমোদে নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহারও অভ্যন্তরে সেই আমোদের উচ্ছ্বাস, লহরী লীলা খেলিতে থাকে; আবার সেই হৃদয় যখন বিলাসের মোহন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অলসের পদে আত্মসমর্পণ করেন,তখন জাতীয় সাহিত্যও সেই বিলাসের বিভ্রম ভঙ্গীতে অনুরঞ্জিত রহে। আবার জাতীয় হৃদয়, মর্ম্মান্তিক শোক জনিত অন্তর্দাহে দগ্ধ হইলে,জাতীয় সাহিত্যও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্য সেই জাতির অন্তরের কথা যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, জাতীয় ইতিহাসে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। জাতীয় ইতিহাস প্রায়ই বাহিরের কথায় অনুপ্রাণিত—জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় হৃদয়ের গভীর মর্ম্মস্থল হইতে সমুদ্ভুত ও জাতীয় হৃদয়ের নিভৃত কক্ষস্থিত তুলিকা স্পর্শে চিত্রিত; সুতরাং জাতীয় হৃদয়ের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তনও ইহাতে বিভা-

যিত র ও জাতীয় পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক পদচিহ্ন ইহাতে অঙ্কিত থা।

বৈদিক সময়ে মানব সমাজের প্রথম সৃষ্টি; মনুষ্য হৃদয় তখন প্রভাত পদ্মের ন্যায় কোমল ও নির্ম্মল—নবমল্লিকার ন্যায় সুকুমার ও পবিত্র। বেদ এইরূপ কোমল পবিত্র হৃদয়ের মধুর বিকাশ। সুতরাং বেদের সর্ব্বত্রই শিশুর সারল্য—শিশুর সৌকুমার্য্য ও শিশুর পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। কপটতার নাম মাত্র ইহাতে নাই। বৈদিক ঋষিগণ প্রভাত রবির উদয়োন্মুখী প্রভাঃ সন্দর্শনেই চরিতার্থ—চন্দ্রমার নিষ্কলঙ্ক মধুর জ্যোতিতে মুগ্ধ, আবার অগ্নির রৌদ্র মূর্ত্তি ও তাহার অপরিমিত তেজ সন্দর্শনে তাহার নিকট যুক্ত হস্ত হইতেন। তাঁহারা সকল কার্য্যেই দেবানুগ্রহের প্রার্থী ছিলেন। শিশু যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই চীৎকার করিয়া থাকে, সে চীৎকারে কপটতা নাই, লুকোচুরি নাই, উচ্চাভিলাষ নাই, আহার পাইলেই সন্তুষ্ট —যাহা আবশ্যক তাহা পূরণ হইলেই প্রসন্ন চিত্ত; বৈদিক সময়ের ঋষিগণও সেইরূপ প্রয়োজন হইলেই ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদির উদ্দেশে শিশুর সরল আধ আধ স্বরে চীৎকার করিতেন—আবশ্যক পূর্ণ হইলেই হৃষ্ট চিত্ত হইতেন। বেদ সেই সরল শিশুর সরল আধ আধ মিষ্টস্বর। তাঁহারা প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে, অব্যক্ত বিহঙ্গ কলরবেরন্যায় সেই অর্দ্ধস্ফুট মধুর স্বরে, সেই অচিন্ত্য—অব্যক্ত—অবর্ণনীয় শক্তির বন্দনা করিতেন—তাহাতে কৃত্রিমতা কিছুই নাই। শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠ-স্বরে হৃদয় সুশীতল হয়, মনে অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়, কিন্তু তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না,—অক্লেশে বুঝা যায় না, তত্রাপি কেমন হৃৎ প্রফুল্লকর; বেদের ভাষাও

সেই রূপ—সহজে বুঝা যায়না—তত্রাপি কেমন প্রীতিপ্রদ—কেমন মনোমুগ্ধকর, কেমন প্রফুল্লতা উন্মেষক। শুনিলেই বুঝি বা না বুঝি মন আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে।

৺বেদের পর সংহিতা কাল। মনুর সময়ে সমাজ আর অপূর্ণ প্রাথমিক সমাজ নহে, তখন সমাজ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে, মনুষ্যগণ রাজনীতির কঠোর কূট তর্ক লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে;) তখন রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি লইয়া মনুষ্য হৃদয় ব্যস্ত হইয়াছে—রাজনীতির কুটিল কৌশলের সহিত সমাজ-নীতি—ধর্ম্ম-নীতি এক সূত্রে গ্রথিত হইতেছে। রাজা তখন স্বর্গভ্রষ্ট দেবরূপী মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; পণ্ডিতগণের হৃদয়ে তখন আত্মগৌরব—আত্মাভিমান প্রবেশ লাভ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগকে মূর্খ হইতে পৃথক করিতে সচেষ্টিত হইয়াছেন; বলবানও দুর্ব্বল হইতে পৃথক থাকিতে যত্ন করিতেছেন; ব্যবসায়ীবৃন্দ আপনাদের লাভ জনক কার্য্য আপনাপন সন্তানেই আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন! সুতরাং তখন সমাজের অবস্থা অত্যন্ত আবর্ত্তময়—তখন সমাজের উপর দিয়া বিষম তরঙ্গ মালা ছুটা ছুটি করিতেছে তখন আর মনুষ্যগণ অল্পে সন্তুষ্ট নহেন, আপনার আবশ্যক পূর্ণ হইলেই আর আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন না, এখন পরিণাম চিন্তন জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ পথ পাইয়াছে; সমাজের আভ্যন্তরিক ভেদ অনেকেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন; সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্য মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ প্রণতী সংহিতা; সুতরাং ইহাতে আর বেদের শিশুর সারল্য, শিশিরসিক্ত প্রভাত পদ্মের পবিত্র শোভা দেখিতে পাওয়া যায় না; ভাষা আর শিশুর অর্দ্ধস্ফুট চিত্তরঞ্জক স্বর নহে—তখন সেই শিশুর

কথা সম্পূর্ণ রূপে ফুটিয়াছে; সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তখনও দ্রুত কথা কহিতে গেলে দুই একটি রুদ্ধ স্বর বাহির হইয়া পড়ে, তাহা আর সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সংহিতার ভাষায় শিশুর সৌকুমার্য্য নাই—তৎপরিবর্ত্তে উদ্ধত বালকের অনর্গল রসহীন কথা স্থান পাইয়াছে; তাহা শিক্ষিত কাকাতুয়ার চঞ্চল—গভীর—তীব্র অথচ মিষ্ট কথা আবৃত্তির ন্যায়।

সংহিতার পর রামায়ণ। রামায়ণের সময় লোকের প্রকৃতি ভিন্ন প্রকার—সামাজিক অবস্থা ভিন্ন প্রকার। সংহিতার সময়ে সমাজস্থ সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য লাভ করিবার জন্য সচেষ্টিত; সুতরাং তখন সমাজকে সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্যই সংহিতার সৃষ্টি সাধন,এবং সেই জন্যই রাজার প্রতি দেবতার আরোপ; রাজা ভূদেব;) তিনি যাহা বলিবেন তাহা কাহারও অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই, কেন না তিনি সকলের মঙ্গল বিধানার্থ মনুষ্য রূপে বিধাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। এই সময়ের বিশৃঙ্খল সমাজকে সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্যই সংহিতায় সকল প্রকার বিধি ব্যবস্থার কথা। মন্বাদি শাস্ত্রকারগণ তাৎকালিক-সমাজের আভ্যন্তরীণ ভেদ দর্শন ও পরিণামে তাহার সুখময় ফল উৎপাদন জন্যই নানাবিধ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। তাঁহাদের পরিণাম দর্শনের সেই অভীপ্সিত ফল রামায়ণ। রামায়ণের সময়ে আর সমাজের আবিলতা নাই; সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়াই মহাসুখী—সমাজ নির্ম্মল,স্বার্থত্যাগের বিজলী-ছটা ও প্রীতির রমণীয় ঘটা সমাজের উপর দিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে; সে সময়ে ভারতীয় সভ্যতার নবীন যৌবনের মনোহর লাবণ্যছটা সমাজের সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—প্রেমের

মধুর উচ্ছ্বাস, সকলেরই হৃদয় কন্দরকে উদ্বেলিত করিয়াছে। সে সময়ে সর্ব্বস্থানেই কুসুমিত উদ্যান—রমণীয় জ্যোৎস্নার মনোহর রজত ছটা—বাসন্তীয় মৃদু মধুর মলয় মারুতের সুমধুর নিঃস্বন প্রভৃতি যাহা কিছু সুন্দর—যাহা কিছু প্রেম দ্যোতক—যাহা কিছু প্রীতি উন্মেষক তৎ সমুদায়ই তখন-কার সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। সেই জন্যই প্রেম—প্রীতি—দয়া—সারল্য প্রভৃতি সমুদায় সদ্গুণের আধার রামচন্দ্র সেই সময়ের অবতার—আর বিচিত্র কল্পনার ঋষি ভগবান্ বাল্মিকী সেই সময়ের কবি; পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয়, কোন সাহিত্যে, বাল্মিকীর তুলনা নাই। রামচন্দ্র দয়ার উৎস—প্রীতির প্রস্রবণ—প্রেমের সাক্ষাৎ অবতার। সুখে—দুঃখে, সম্পদে—বিপদে, রাজসভায়—বৃক্ষতলায়, সুবর্ণ মণ্ডিত সিংহাসনে—ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যস্থিত নিকেতনে, নানা-বিধ মণি-মাণিক্যাদি খচিত রাজাভরণে—ও জটা বল্কল পরি-ধানে তাঁহার সমান প্রীতি—সমান তৃপ্তি—সমান শান্তি; কিছুতেই দিনেকের জন্য তাঁহার মনে অশান্তির উদয় হয় নাই। লক্ষ্মণের ন্যায় ভ্রাতৃ স্নেহের নিদর্শন ভারতীয় আর্য্য ভিন্ন আর কোন্ জাতিতে সম্ভবে? ভ্রাতার জন্য আত্মোৎসর্গের জীবন্ত মূর্ত্তি লক্ষ্মণ ও স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ ভরত। রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ বা ভরতের চরিত্র কোন জাতিতেই পাওয়া যায় না; এবং এই জন্যই হোমার—বর্জ্জিল, সেক্ষপীর—মিল্টন প্রভৃতি কবিগুরু সকল থাকিলেও বাল্মিকীর সমকক্ষ কেহই নহেন। হোমার প্রভৃতি কবি শ্রেষ্ঠগণ অসামান্য প্রতিভা প্রদর্শন করিলেও বিভিন্ন সামাজিকতার জন্য বাল্মিকী ব্যতীত আর কেহই রামচরিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। বাল্মি-

কীর ভাষাও সেইরূপ পূত—তাহার সর্ব্বত্রই বাসন্তীয় কুসুম সৌরভ,সকল স্থানেই নবমালিকার কোমলতা, সকল স্থানেই মলয় মারুতের নিঃস্বন। যেন বৈদিক কালের সেই শিশুর অমিয় জড়িত অর্দ্ধস্ফুট মুগ্ধকর স্বর—সংহিতা কালের দশম বর্ষীয় বালকের মধুর রসহীন আলাপ—বাল্মিকীর সময়ে নবীন যৌবনের উন্মেষে সর্ব্বত্রই ধীরে ধীরে প্রীতি ও প্রেমের গান গাহিতেছে। যেমন সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর, তেমনই সুমিষ্ট ও সরলতাগ্রথিত। বাস্তবিক বাল্মিকীর সময়ে সমাজ যেরূপ উৎসাহ—প্রীতি ও পবিত্রতাময়, সে সময়ের ভাষাও সেই রূপ সরস—সরল ও সুধা পূর্ণ।

বাল্মিকীর সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সময়ে উপস্থিত হইলে সমাজ সম্পূর্ণরূপে—পার্থক্য অবলম্বন করিয়াছে দেখা যায়। তদানীন্তন সমাজ আর নবীন যৌবনে অবস্থিত নহে—তখন আর প্রেমের মোহন-মন্ত্র হৃদয়ের শান্তি নিকেতন নহে। যৌবন সুলভ অমায়িকতা—নবীন উৎসাহের পবিত্র ভাব—বসন্তের কমনীয় কান্তি—স্ফুট নলিনীর কোমলতা আর তাহাতে নাই; সমাজ তখন অতীত যৌবনে অবস্থিত; ঐ সকলের পরিবর্ত্তে তখন সমাজে স্বার্থের দুশ্চিন্তা—কপটতা—কৌশল—রাজনীতির কুটিল চক্র স্থান পাইয়াছে; তখনকার সমাজে আর এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার জন্য আপনার স্বার্থত্যাগ করিতে চাহে না; তখন সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব লাভার্থ লালায়িত। আত্মগৌরব তৎকালে সকলেরই মনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; স্বীয়স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য তখন মনুষ্যগণ হিমালয় হইতে কুমারিকা, পঞ্চনদ হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ছুটা ছুটী করিতেছে; তখন প্রেম ও প্রীতির পরিবর্ত্তে কূট মন্ত্রণা ও

রাজনীতি স্থান পাইয়াছে; সুতরাং দয়ার উৎস রামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে কুটিল রাজনীতি কুশল—কূট যুদ্ধপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ের অবতার, ও বাল্মিকীর পরিবর্ত্তে কুটিল বেদব্যাস কবি ; আর যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধন, ভীমার্জ্জুন এ সময়ের প্রধান পুরুষ। পঞ্চপাণ্ডবে বাল্মিকীর সময়ের ন্যায় ভ্রাতৃভাব ও ভ্রাতৃপ্রেম কোথায় ? এক্ষণে ভ্রাতৃভাব ও ভ্রাতৃপ্রেম রাজনীতির অধীন হইয়াছে ; এখন সমাজে কেবল ছলনা—বঞ্চনা—ঈর্ষা বিরাজিত ; সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য আসিয়া যুটিয়াছে ; আধুনিক কালের লুকাচুরী অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ;—না হইলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার হইয়াও, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ," বলিবেন কেন ? তখন কোন প্রকারে কার্য্যোদ্ধার করাই তদানীন্তন সমাজের অন্তরের প্রধান কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আবার উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত কবি বেদব্যাস। আধুনিক প্রধান রাজনীতিজ্ঞগণও যে সকল মন্ত্রণা দিতে সঙ্কুচিত হন, ব্যাস তাহা অম্লান বদনে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের সময়ে আর প্রেমের পবিত্র ভাব নাই—পরের জন্য আত্মোৎসর্গ চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, প্রীতির সুমধুর উচ্ছ্বাস আর সমাজকে প্রফুল্ল করিতে পারে না ; যেন সমাজের সর্ব্বত্রই নিদাঘীয় প্রবল মার্ত্তণ্ডের তাপ। সেই জন্যই প্রৌঢ় পুরুষের স্বার্থলাভের উপায় চিন্তনের ভাষা স্বরূপ, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ভাষাও রসহীন—সরলতা নয় কপটতা পরিপূর্ণ। বেদব্যাসের সময় বাল্মিকীর সেই মধুর বীণা ঝঙ্কার, গম্ভীর ভেরীর রবে পরিণত হইয়াছে ; সে রবে আর প্রেমিকের মন মোহিত হয় না, তাহা বিষয়-বাসনা-দৃপ্ত হৃদয়ের শান্তিস্থল স্বরূপ হইয়াছে। এখন ভাষা কঠিন ভার-

বহন করিতে সমর্থ, কেবল প্রেমের কথা নহে, রাজনীতি—ধর্ম্মনীতি—সমাজনীতি—দর্শন—বিজ্ঞানের ভারবহন করিতে সমর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারই কিছু পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল তত্ত্বশাস্ত্রের বীজসূত্র লইয়া দার্শনিক চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়াছেন; সুতরাং এ সময়ের ভাষা খুব সতেজ ও তীব্র। স্বার্থ ও প্রেম এক আধারে, এক সময়ে থাকিতে পারে না; স্বার্থ আপনা লইয়াই ব্যস্ত,—যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দর্শন করে তাহা আপনি লইবার জন্য সচেষ্টিত—স্বার্থ স্বাধীনতার মূর্ত্তি বিশেষ, সে কাহারও অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে চাহে না—পরাধীনতা, পরোপাসনা তাহার নিকট হইতে সুদূরে প্রস্থান করে, কিন্তু পরাধীনতা ও পরোপাসনাই প্রেমের প্রাণ; প্রেমের মূলে পরোপাসনা, প্রেমের পরিণামে পরের নিকট আত্মোৎসর্গ। মহাভারতে এমন স্বার্থশূন্য আত্মত্যাগের উদাহরণ একটিও দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং যে সময়ে লোকের স্বার্থ-পূর্ণ হৃদয়ে প্রেমের মোহন লহরী লীলা খেলেনা, সে সময়ের ভাষায় মধুরতার মোহন ছবি কেন দেখিতে পাওয়া যাইবে? মহাভারতের সময় চতুর্দ্দিকেই যুদ্ধ বিগ্রহ, সর্ব্বত্রই স্বার্থ সিদ্ধির কুটিল মন্ত্রণা—তাই তাহার ভাষাও কুটিলতা পরিপূর্ণ—তাই কূট মন্ত্রনাময় শ্রীকৃষ্ণ রাজনীতির বঙ্কিম কৌশলে সদত নিমগ্ন থাকিলেও দেব বলিয়া গণ্য। সুধু স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, তাঁহারই চক্রে পড়িয়া, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী মনুষ্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিল—শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই এই রূপে ভূভার হরণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের পর শ্রীমদ্ভাগবতের কাল। মহাভারতের সময়ে সমাজ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য বিব্রত; সেই স্বার্থ-

সিদ্ধির সম্মুখে ভয়ানক অবৈধ কার্য্য সকলও অকরণীয় বলিয়া বোধ হয় নাই ;—যাহার যাহাতে ইষ্টলাভ হইবে লোকে তাহাতেই প্রমত্ত হইয়া ছিল ; স্বার্থ লাভের প্রধান অন্তরায় ধর্ম্মচর্চ্চাও কাজেই তখন সুদূরে প্রস্থান করিয়াছিল—ধর্ম্মনীতির সহিত স্বার্থসিদ্ধির চিরশত্রু ভাব—সুতরাং লোকের মন হইতে তখন প্রকৃত ধর্ম্ম ভাবের সম্পূর্ণ অভাব হইয়াছিল ; তখন যাহার যাহা ইচ্ছা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি তাহাই করিতেন। সুতরাং সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এই সময় দোলায়মান হইয়াছিল। ভারতের সময় সমাজ বীর ভাবাশ্রিত ; পরপীড়ন—পরমর্দ্দন—অযথা অত্যাচার সে সময়ের বীরের ধর্ম্ম ; সুতরাং ধর্ম্মনীতিও তখন বীর-ভাবাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে ; পরপীড়ন—পরমর্দ্দন তখন ধর্ম্মের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তখন পশু-রক্তপৃক্ত পুষ্প ভিন্ন দেব দেবীর অর্চ্চনা করা হয় না—জাতীয় প্রথা ঈষৎ বিচলিত হইয়াছিল ; যাহা হউক মহাভারতের সময়েই হিন্দুধর্ম্মের মূলগ্রন্থি কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ ক্রমে শমতা প্রাপ্ত হইল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই বিকৃত ভাব সহজে অন্তর্হিত হইল না ; সুতরাং ধর্ম্মের সংস্কার করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল ; তাই মহাযোগী শাক্যসিংহ ভারত ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মহাভারতের বহু পূর্ব্ব-সময় হইতেই লোকের মনে দার্শনিক চিন্তা স্থান লাভ করিয়াছে ; বুদ্ধদেব সেই দর্শন লইয়াই ভারতভূমে অবতীর্ণ হইলেন—সেই দর্শন লইয়াই ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন ; তাহার রমণীয় ফল ফলিল ; তিনি জ্ঞানাস্ত্র প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের যাবদীয় কুসংস্কার রাশি দূরীকৃত করিয়া সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিলেন ; ভারতবাসী তাঁহার ধর্ম্ম

ভাবে বিভোর হইয়া গেল—সমুদায় ভারতবাসী, তাঁহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল; ভারতবর্ষ অনেক দিনের পর এক-বার উঠিয়া বসিল; ইহার সর্ব্বত্রই আলোকময়—সকল স্থানেই অহিংসার দিব্যমূর্ত্তি বিরাজমান। এই ধর্ম্মসংস্কার কালে নানাবিধ সুন্দরগ্রন্থ প্রণীত হইল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই বিজয় লাভ চির প্রাধান্য লাভেচ্ছু ব্রাহ্মণের উপর লৌহ শলাকা বর্ষণ করিতে লাগিল; তাঁহারা ইহার ধ্বংশ কামনা করিতেছিলেন, বিনাশ করিবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতে ছিলেন, কাব্যের সহিত দর্শন মিলাইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা দেখিতেছিলেন। কিন্তু এই দুই পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মের সংঘর্ষণে সমাজে মহা হুলস্থুল ঘটিয়া উঠিল; ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস পূর্ব্বেই ঘটিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ পুনরায় ঈশ্বরের নাস্তিত্বে অবিশ্বাস সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; লোকের মন সন্দেহ-দোলায় অবস্থিত হইল—কোন কিছুতেই হৃদয় আশ্বস্ত হইতে পারিল না; জাতীয় হৃদয় তখন স্বাধীন ভাবে নানা দিকে প্রধাবিত হইল; এমন সময় বোপদেব সমাজে জন্মগ্রহণ করি-লেন; বোপদেব দার্শনিক এবং বোপদেব কবি। শ্রীমদ্ভাগবৎ তাঁহার দার্শনিক কাব্য (৩)। দার্শনিক কবিগণ আপনা-

---

(৩) বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবৎ কার কিনা সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবে সাধারণ মত উহাই বলিয়া আমরা শ্রীমদ্ভাগবৎ বোপদেব প্রণীত বলিলাম। বোপদেব আধুনিক লোক, তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং ভাগবৎ কখন তাঁহার প্রণীত হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবৎ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, তাঁহার জন্মের অনেক পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে।

দিগে কঈশ্বর নির্ণয়ে সমর্থ বিবেচনা করেন; শ্রীমদ্ভাগবৎকার তাহাই করিলেন। তিনি বুঝিলেন ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ আর লোকের তৃপ্তিকর নহে—তাঁহারা আর লোকের মনে শান্তি প্রদান করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে অন্য দেবতা গ্রহণ করিতে হইল এবং সেই জন্যই মহাভারতের সময় যিনি দেবরূপে কীর্ত্তিত হইয়া ছিলেন, তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণকেই আপন অভীষ্ট দেব রূপে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মহাভারতকার তাঁহাকে যে ভাবে লইয়াছিলেন তিনি তাহা লইলেন না; শ্রীমদ্ভাগবৎকার শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলা গ্রহণ না করিয়া স্বীয় কল্পনাবলে তাঁহার বাল্য ব্রজলীলা গ্রহণ করিলেন। তিনি দার্শনিক ঋষি; সাংখ্য পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র সকল তাঁহার চির সহচর; সাংখ্য প্রভৃতির প্রকৃতি পুরুষ জ্ঞান তাঁহার সর্ব্বস্ব; তিনি শ্রীমদ্ভাগবতে সেই প্রকৃতি পুরুষেরই অবতারণা করিলেন; পুরুষ স্থলে মহাভারত হইতে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিয়া স্বকপোল বলে রাধিকাকে প্রকৃতি স্থানীয়া করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের অভেদ জ্ঞানের নাম সংসার, ও ভেদ জ্ঞানের নাম মুক্তি; দর্শনের এই কথা তিনি শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিলেন। এবং এই জন্যই তিনি রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন অস্বাভাবিক বলিয়া বর্ণন ও পরিশেষে তাহাদের পরস্পর বিচ্ছেদ বা ভেদই মুক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎকার এই রূপ কৌশল করিয়া ভারতের ধর্ম্ম পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্টিত হইলেন, শেষে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল; লোক সকল তাঁহার প্রেম রসে—তাঁহার ভক্তি রসে নিমজ্জিত হইল; বৌদ্ধ যতিগণ চিরদিনের জন্য ভারত ছাড়িয়া দূরতর দেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ দার্শনিক

কাব্য; সুতরাং তাহার ভাষাও কিঞ্চিত কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না; এই সময় হইতেই হিন্দুধর্ম্মে কৌশল প্রবেশ লাভ করিল; ইহারই ফল পরবর্ত্তী পুরাণ সকল।

শ্রীমদ্ভাগবতের পর পৌরাণিক কাল। এ সময়ে সমাজের অবস্থা ভিন্ন প্রকার; এক্ষণে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আবাস স্থান; পৌরাণিক সময়ে সমাজে নানাবিধ কৌশল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তখন আর্য্যগণ নানা প্রকার সংগ্রাম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; চতুর্দ্দিকস্থ নানাবিধ বিলাস সামগ্রীর প্রলোভন আর সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না, এই সময়ের পূর্ব্বেই দুই এক জন জ্ঞান সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়া লোকের মনে বিভিন্ন নীতির উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন; বৈদিক ক্রিয়াকলাপ নিতান্ত দুরূহ বলিয়া পূর্ব্বেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; পৌরাণিক সময়ে সমাজ বৃদ্ধ; বৈদিক সময়ের শিশুও তৎসঙ্গে প্রৌঢ় দশার শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। প্রৌঢ় বয়সের কার্য্য যৌবন-কৃত পাপ স্মরণে, তাহার ক্ষালন; প্রারম্ভপ্রৌঢ়ে যে সকল গর্হিত কার্য্য করিয়াছে তাহার জন্য অনুতাপের কাল বৃদ্ধাবস্থা। পৌরাণিক সময় প্রায়শ্চিত্যের সময়। প্রারম্ভপ্রৌঢ়ে বিষয়বাসনা রূপ বহ্নিতে যে সকল গর্হিত কার্য্য আহুতি প্রদান করিয়াছে তাহার নিমিত্ত প্রায়-শ্চিত্যের প্রয়োজন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্য করিবে কি? বৈদিক সময়ের অর্দ্ধরুদ্ধ শব্দে তখন আর হৃদয় সুশীতল হয় না—তখন মৃত্যুর বিকট দশন নয়নে এক একবার দেখা যাইতেছে। বৈদিক ক্রিয়া কলাপ কঠোর বলিয়া স্বার্থান্বেষণের সময় পরি-ত্যক্ত হইয়াছে, সমাজ এক্ষণে কিয়দংশে আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়াছে; সুতরাং কঠিন ক্রিয়া কলাপ আর ভাল লাগিবে

কেন? তাহার পরিবর্ত্তে সহজে করণীয় ও অনায়াস বোধ্য প্রকরণের প্রয়োজন; এইরূপ সমাজের ফল পুরাণ সকল। বেদ শিক্ষা করিতে গেলে নানাবিধ শাস্ত্রের সাহায্য আবশ্যক। শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ-ছন্দ-ঋষি-স্বরাদি জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়; সুতরাং এ সময়ের অলস ও শীঘ্র ফললাভেচ্ছু সমাজে বেদের আদর ঘটিয়া উঠিল না; কারণ বেদ বিষম পরিশ্রম সাপেক্ষ ও সুন্দর ফল প্রসবী। তাই ব্যাকরণ বোধমাত্র-বোধ্য পুরাণ এই সময়ের শাস্ত্র। বেদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না হইলে যজমান-হোতা, আচার্য্য-শ্রোতা, কাহারও ফল লাভ হয় না; কিন্তু পুরাণ পাঠ সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করিলেই সমুদায় ইষ্টসিদ্ধি হয়। পৌরাণিক কালে জাতীয় হৃদয়ের সহানুভূতির ফল পুরাণ সকল। পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়—বক্তা স্বর্গগামী হয়—অনুষ্ঠাতা পরমসুখী হয়, সুতরাং সেই পুরাণ যাহাতে সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম ও সকলের হৃদয়াকর্ষক হয় তাহা করা প্রয়োজন; সেই জন্যই পুরাণের ভাষা—মনোহর—অনায়াস বোধ্য সুললিত ও মার্জ্জিত। বিশেষতঃ পৌরাণিক কালের পূর্ব্বে যে দুই একজন জ্ঞান সন্ন্যাসী জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ তুলিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই সকল নিরাকরণ করিয়া, যাহাতে সকল লোকেই পুরাণের শীতল ছায়ায় বসিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, তাহার জন্য ঋষিগণ বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছেন। তাই পুরাণের ভাষা সাধারণতঃ পরিপাটি—সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

পৌরাণিক কালের পর কালিদাস প্রমুখ কবিগণের কাল। এ সময়ে সমাজ বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রেমের

মোহিনী বীণা পুনরায় লোকের কর্ণে সুধা ঢালিতেছে—যেন বৃদ্ধ সমাজে নবযৌবনের মোহনস্মৃতি প্রবেশ পথ পাইয়াছে! বৃদ্ধ বয়সে প্রেমের সরস কথা যেমন সুমধুর লাগে এমন আর কিছুই নয়। কালিদাসের সময়ে সমাজের প্রথম বার্দ্ধক্য দশা; প্রথম বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্ম ও প্রেমের কথায় মন যেমন প্রীত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না; এ সময়ের সমাজ ধর্ম্ম ও প্রেম-ময়; ইহাতে ধর্ম্মের সংকোচন ও প্রেমের প্রসারণ ভাব উভ-য়ই পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্যই কালিদাসীয় সমাজ কখন রমণীর বিভ্রম বিলাসভঙ্গী ও মনোহর লাবণ্যলীলায়, আবার কখন বা সমাধির নিবাত-নিষ্কম্প-স্থির গম্ভীরভাবে প্রমত্ত থাকিত। এই জন্যই মহারাজ দুষ্মন্ত তপোবনে ঋষিকন্যার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, বৃক্ষের অন্তরাল হইতে লুকাইয়া লুকাইয়া অনুপম মধুরিমা অবলোকনে আত্মবিহ্বল হইলেও পরক্ষণে ধর্ম্মের সংকোচনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে দুর্গম অরণ্যজাত—কণ্টকবেষ্টিত কুসুমের ন্যায় অস্পর্শনীয় জ্ঞান করিতেছেন; সেই জন্যই দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর-পর্ব্বতের ন্যায় অচল—অটল—ধ্যাননিমীলিত নেত্র যোগীন্দ্রের নিকট কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ গীত গাহিতে—চঞ্চল পশুগণ পাদচারনা করিতে—এমন কি পবনদেব সামান্যমাত্রস্বনন্ করিতে সাহস না পাইলেও, গিরিরাজ তনয়া অবাধে—নিঃশঙ্কিতচিত্তে, সেই নিবাত—নিস্তব্ধ—স্থিরগম্ভীর স্থানে অনায়াসে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন—পুষ্পের মালা গাঁথিয়া যোগীন্দ্রের গলায় জড়া-ইয়া দিতেছেন। তাই প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি মদন দগ্ধ হইয়াও জীবিত—তাই প্রেম কোপানলে পুড়িয়া ভষ্ম হইলেও ধর্ম্মের জীবন্তমূর্ত্তি যোগীশ্বরের আবার শিরোভূষণ হইল। কালিদা-

সীয় সমাজে এইরূপে ধর্ম্ম ও প্রেমের বিবাদ বিসম্বাদ দেখি; আবার বিবাদে প্রথমে প্রেম নিগৃহীত হইলেও পরিশেষে তাহারই বিজয়লাভ সন্দর্শন করি। এই প্রেমভাব তখন সমাজের সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে; "ব্রাহ্মণ-শূদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ' তখন সকলেরই মনে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে; সকলেই আপনাপন মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রকাশ করিতেছে। পণ্ডিতের ভাব প্রকাশের শব্দের সহিত, মূর্খের শব্দ মিলিতে পারে না; তাই তখন নানাপ্রকার শব্দ সমাজে স্থান পাইয়াছে—তাই তখন মাগধী-শৌরসেনী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃত ভাষা জন্মলাভ করিয়াছে। কালিদাসাদির সময়েই যে প্রাকৃত ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে; তাঁহার সময়ের বহুকাল পূর্ব্বেই ইহাদের উৎপত্তি; তবে এই সময়েই প্রাকৃত ভাষা সকল, সংস্কৃত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে—এই সময়েই প্রাকৃত ও সংস্কৃত এক গ্রন্থনে গ্রথিত হইয়াছে। রামায়ণ বা মহাভারতের সময়ের ন্যায় সংস্কৃত এক্ষণে আর সাধারণ কথোপকথনের ভাষা নহে। নানাবিধ প্রাকৃত ভাষায় এক্ষণে প্রায় সকলেই স্ব স্ব মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে; পৌরাণিক সময়ের পূর্ব্বেই অনেক ভাষার সৃষ্টিসাধন হইয়াছে; বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ষড়-পঞ্চাশৎ প্রকার ভাষার উল্লেখ আছে (৪)। তবে আমাদের এ সময়ে প্রাকৃত ভাষার কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কালিদাসাদির সময়ে

---

(৪) ততোভাষাশ্চ সম্ভূজে পঞ্চাশৎ ষট্ চ সংখ্যয়া।
তজ্জ জানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানিচ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

এই সকল ভাষা পণ্ডিতগণেরও ব্যবহার্য্য হইয়াছে। সত্য বটে, কালিদাসাদি জন্মিবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই বুদ্ধদেব মাগধী ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু বুদ্ধদেব ধর্ম্মসন্ন্যাসী—তাঁহার সময়ে প্রচলিত ভাষা গাথা—যাহাতে ইতরলোক পর্য্যন্ত তাঁহার সনাতন ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে তাহাই তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ; এবং সেই জন্যই তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত হইলেও গাথা বা পালিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; বুদ্ধদেবই কেবল পালিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে পণ্ডিতগণ স্বীয় গ্রন্থে যেরূপে সংস্কৃত ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপেই প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়ে প্রাকৃত নানা প্রকার ভাষা সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে; ইহা প্রচলিত হইবার কারণ নির্দ্দেশ করাও কঠিন নহে। কালিদাসীয় সমাজের বহু পূর্ব্বকাল হইতেই লোকে শনৈঃ শনৈঃ বিলাসের বশবর্ত্তী হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তখন দেবভোগ্য ভারতভূমি সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের উপভোগ্য হইয়াছে; দেবতার প্রীতি সম্বর্দ্ধক পদার্থ সকল মনুষ্যগণ অবাধে ভোগ করিতেছেন; সুতরাং মনুষ্যগণ অনেকদিন হইতে বিলাসরসের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বিলাসী হইলেই লোকে অলস হইয়া পড়েন। সুতরাং বিলাসের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে আলস্য প্রবেশ পথ পাইয়াছে; আলস্য আসিলেই পরিশ্রম দূরে প্রস্থান করে— সুতরাং পরিশ্রমলব্ধ সামগ্রী সকলও অন্তর্হিত হয়। সংস্কৃত শিক্ষা পরিশ্রম সাপেক্ষ; কাজেই অলস সমাজে সংস্কৃত শিক্ষা সুদূরে প্রস্থান করিল; কিন্তু তাহার স্থান কখন শূন্য থাকিতে পারে না; ভ্রষ্ট সংস্কৃত তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল; ক্রমে যতই সমাজ আলস্যের বশবর্ত্তী

হইতে লাগিল ততই ভ্রষ্ট সংস্কৃতের উচ্চারণও দুরূহ বোধ হইয়া আসিতে লাগিল; সুতরাং হস্তের পরিবর্ত্তে হথ, মধ্যের পরিবর্ত্তে মজঝ, প্রস্তরের পরিবর্ত্তে পথর, মিথ্যার পরিবর্ত্তে মিচ্ছা, বৃদ্ধের পরিবর্ত্তে বুড্‌ঢ ইত্যাদি শব্দ স্থান লাভ করিল। শেষে এই প্রাকৃত ভাষাই এত প্রবল হইয়া উঠিল যে তাহা রক্ষার জন্য ব্যাকরণের আবশ্যকতা হইল। তাই কাত্যায়ন—বররুচি প্রভৃতি ঋষিগণ, "প্রাকৃতপ্রকাশ" প্রভৃতি ব্যাকরণ লিখিলেন; এইরূপে প্রাকৃতের জন্মলাভ ও পুষ্টিসাধন। কালিদাসাদির সময়ে সংস্কৃত ভাষা অতি যত্নে শিক্ষণীয়া হইয়াছে; তাহা আর প্রচলিত ভাষা নহে। সেইজন্যই পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ মহারাজা বিক্রমাদিত্যও কোন সময়ে—"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্তে যদি বাধতি" বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিলেন; সেই জন্যই কালিদাস মহাকবি ও তাঁহার ভাষা মনোমুগ্ধকর হইলেও তাহা অনায়াসবোধ্য নহে; এবং এই জন্যই কালিদাস যক্ষরূপে আপন স্ত্রীর জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া বিরহের গীত গাহিলেও, তাহা সহজে বুঝা যায় না; যেন ভাষার ভিতর কোন অলক্ষিত কৌশল প্রবেশ করিয়াছে; সে কৌশল ঐন্দ্রজালিকের কৌশলের ন্যায়; সহজে তাহার ভিতর প্রবেশ করা যায় না অথচ তাহাতে যে কি মাধুর্য্য—কি চাতুর্য্য—কি মাদকতা আছে, দেখিলে আর তথা হইতে ফিরিতে মন সরেনা; ইচ্ছা, যেন কালিদাস সাগরে নিমজ্জিত হইয়া শরীর মন সুশীতল করি। বাস্তবিকই কালিদাসের তুলনা জগতে দুর্লভ; তাঁহার ভাষার চমৎকারিত্ব—মনোহারিত্ব—ওজস্বিতা ও নানাদিকে প্রসারণের ক্ষমতার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সংস্কৃত ভাষা

তখনও এক্ষণকার ন্যায় পণ্ডিতের ভাষা—যত্ন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। কালিদাসীয় সমাজে বিলাসরস লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে—লোকে প্রেমের মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ হইয়াছে—আলস্য পরিশ্রমের স্থান অধিকার করিয়াছে—সর্ব্বত্রই কোমলতা—মধুরতা স্থান পাইয়াছে, তাই সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কোমল-মধুর প্রাকৃত সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। সেই অবধি ইহা একচ্ছত্রে রাজত্ব করিতেছে—ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থলই ইহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে—ইহার বংশ বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া আর কেহই ইহাকে সিংহাসন হইতে নড়াইতে পারে না ;—তাহার সিংহাসন তাহার বংশেই চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

কালিদাসীয় সমাজের পর জয়দেবের কাল। জয়দেবের সময়ে সমাজ স্থবির হইয়া পড়িয়াছে ; সামর্থ্য নাই—তেজ নাই—উৎসাহ নাই;কেবল জড়তা পরিপূর্ণ। বীরত্বের ঘন ঘটা গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে, মধুর প্রেমালাপ স্থান পাইয়াছে—রণক্ষেত্রের গভীর তূর্য্যধ্বনি, অন্তঃপুরের নূপুর নিক্কণে পরিণত হইয়াছে ; ভারতীয় বীরগণ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াছেন ; সর্ব্বত্রই অসাড়, অবশভাব বিরাজমান। জয়দেবের সময়ে আর্য্য গৌরবের খণি ভারত মাতা জীবন্মৃতা হইয়াছেন,—নড়িবার সাধ্য নাই—কথা কহিবার সামর্থ্য নাই ; যেন কঙ্কাল মাত্রে পরিণতা হইয়া ধূলিশয্যায় শয়ান আছেন। ভারতীয় সমাজও সেই সঙ্গে নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রাবেশে কাতর ও ভোগনিরত হইয়া পড়িয়াছেন। তখন আর রাম—ভার্গব, ভীষ্ম—দ্রোণ, পুরু—বিক্রম নাই ; ব্যাস—বাল্মিকী, মাঘ—ভারবী, কালিদাস—ভবভূতি সমাজের উপর বৈদ্যুতিকবেগ প্রসারণ করে না ; কপিল—কণাদ, গৌতম

—পতঙ্গগুলি পৃথিবীর সুখ ছাড়িয়া অন্তঃপ্রকৃতির গুহাদপি গুহ্যস্থানে প্রবেশ করিয়া গভীর কথা প্রকাশ করে না; এ সকলই সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সমাজ এক্ষণে মুমূর্ষদশাগ্রস্থ—ধুলিশয্যায় শায়িত—নিশ্বাস মাত্র অবশিষ্ট। তাই অন্তঃপ্রকৃতির অন্তঃস্থলে প্রবেশক্ষম দার্শনিক উপেক্ষিত হইয়া বাহ্যসৌন্দর্য্য মোহিত জয়দেব সমাজের শিরোভূষণ হইয়াছেন—তাই যাঁহারা পৃথিবীতে সুখ নাই বলিয়া পারলৌকীক সুখান্বেষণের জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, লোকে রমণীর বিভ্রম বিলাস ভঙ্গীকেই সুখের নিদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ের সমাজ অলস ও ইন্দ্রিয় পরতার দাস; সেই জন্যই দেখিতে পাই ইহার কিছুদিন পরেই বক্তিয়ার খিলিজী সপ্তদশমাত্র অনুচর লইয়া অবাধে বঙ্গরাজ্য স্বীয় করতলস্থ করিল; গীত-গোবিন্দ সেই ইন্দ্রিয়পর—নিশ্চেষ্ট সমাজের ফল। সেই অবধি সমাজে নূতন তান বাজিয়াছে—অন্যান্য কাব্য দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গীতি-কাব্যের আদর বাড়িয়াছে; তৎসমুদায়ই আলস্য—নিশ্চেষ্টতা ও গৃহ সুখ নিরতির ফল। এখন লোকে ইন্দ্রিয়পর—বিলাস বিভ্রমে বিলসিত—আত্মসুখে নিরত, সুতরাং এক্ষণকার ভাষাও যে অতি কোমল—অতি মধুর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কোমল ভাব কোমল ভাষা ভিন্ন কখনই অভিব্যক্ত হয় না ও মধুর লাগে না; সুতরাং তখন দুরুচ্চার্য্য সংস্কৃত বা আবিলতাপূর্ণ প্রাকৃত ভাষা লোকের প্রীতিকর হইবে কেন? তাই সে সময়ে কোমলভাব প্রকাশক কোমল ভাষার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টিসাধন—বাঙ্গালাভাষার ন্যায় কোমলভাব অভিব্যক্তির ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। এই সমাজের স্বত্র

পাত হইতেই ইহার সূত্রপাত—সমাজের বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত। জয়দেবের সময় বাঙ্গালাভাষা নিতান্ত শিশু বালিকা নহে, তখন ইহা আকারে পরিপুষ্টা হইয়াছে। সেই জন্যই দেখিতে পাই, গীত গোবিন্দ সংস্কৃত গ্রন্থ হইলেও, ইহার ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত নহে—ইহার ভাষা বাঙ্গালা সংস্কৃত ; ইহাতে সংস্কৃতের মাধুর্য্য ও বাঙ্গালার লালিত্য উভয়ই আছে। সংস্কৃত হইতে যত ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমুদায় অপেক্ষা বাঙ্গালার সহিত ইহার মিশামিশি অধিক ; বাঙ্গালাভাষায় অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ যেমন অবাধে মিলিতে পারে, অন্য কোন সংস্কৃত মূলক ভাষায় সেরূপ হয় না ; অন্য কোন প্রাকৃত ভাষার সহিত ইহা অবিকৃত ভাবে মিশ্রিত হইতে পারে না। তাই দেখি গীত-গোবিন্দের ভাষা প্রকৃত সংস্কৃত নহে তবে বাঙ্গালা মিশ্রিত সংস্কৃত বা অবিকৃত সংস্কৃত মিশ্রিত বাঙ্গালা ভাষা। গীত-গোবিন্দের অনেক স্থলের রচনার সহিত বাঙ্গালার অতি অল্পই প্রভেদ ; ক্রিয়াপদগুলি পরিত্যাগ করিলে তাহা প্রকৃত বাঙ্গা-লাই হইয়া পড়ে। বিভক্তি ও ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য জন্যই বাঙ্গালাভাষা সংস্কৃত হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে ; নচেৎ বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হইত না। জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালার কুমারী বা প্রথমাবস্থা ; সুতরাং তখন উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কোন একটী ভাষা সৃষ্ট হওয়া সহস্র বৎসরের পরিশ্রমের ফল—এক দিনে ভাষা পূর্ণতা পাইতে পারে না ; আবার পূর্ণতা না পাইলে সে কাহার কন্যা নির্ণয় করাও সুকঠিন ; সুতরাং এক্ষণে যৌবনস্থিতা বঙ্গভাষার আকারগত সৌসাদৃশ্যদৃষ্টে সে কাহার কন্যা নিরূ-পণ করা দুঃসাধ্য নহে। এক্ষণকার বঙ্গভাষার সহিত সংস্কৃতের

অতি অল্পই প্রভেদ। বাঙ্গালাভাষায় যত শব্দ আছে প্রায় তৎসমুদায়ই অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ; প্রাকৃত শব্দ একটিও নাই বলিলেই হয় (৫) সুতরাং আকারগত সৌসাদৃশ্যদৃষ্টে আমরা বাঙ্গালাকে সংস্কৃতেরই কন্যা বলিতে বাধ্য হইব; বাঙ্গালা সংস্কৃতের কন্যা, প্রাকৃতের নহে; তবে সংস্কৃতের যৌবন অবস্থার কন্যা নহে, বৃদ্ধ বয়সের কন্যা। বাঙ্গালা বৃদ্ধ বয়সের কন্যা বলিয়াই ইহার প্রতি সংস্কৃতের অনুগ্রহ অধিক; এই জন্যই সংস্কৃতের শেষে যাহা কিছু অলঙ্কার অবশিষ্ট ছিল ইহা তৎসমুদায়েরই অধিকারিণী। আমরা দেখাইয়াছি বৃদ্ধবয়সে মাতার কেবল কোমলতা—মাধুর্য্য ও লালিত্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল—তাই বাঙ্গালাভাষা কোমলতাময়—মধুরিমাময় ও লালিত্য পূর্ণ এবং সেই জন্যই পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে হইলে জ্যেষ্ঠা সহোদরার মুখপানে তাকাইতে হয়; রাগ প্রকাশের শব্দ বাঙ্গালায় নাই—নীচতা অভিব্যঞ্জক শব্দ বাঙ্গালায় নাই। তাই রাগের কথা বলিতে গেলে হিন্দীর আশ্রয় লইতে হয়, ইতর ভাষায় "তুই—মুই" বলিতে গেলে প্রাকৃতের দিকে চাহিতে হয়। বাঙ্গালা সমুদায় প্রাকৃত ভাষার কনিষ্ঠা ভগ্নী, সেই জন্যই ইহা তাহাদেরও অতি আদরের ধন—এইরূপ সোদর স্নেহ বশতঃই তাহারা ইহাকে অবাধে কথা যোগাইয়া

---

(৫) While in Bengali, except some analogous corruption by contraction and assimilation, which every language undergoes in the mouth of a people, there are very few traces of the Prakrit dialects.& MaxMuller.

থাকে। সেই জন্যই ইহা মাতা ও সহোদরাগণের সমান প্রীতিভাজন; সকলেরই সহিত সমান আহ্লাদে মিশিতে পারে। বাঙ্গালা হিন্দী বা অন্যান্য প্রাকৃতের সহিত যে প্রকারে মিশিতে পারে, সংস্কৃতের সহিতও সেই রূপেই মিশিতে পারে, কিন্তু হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতের সহিত সে ভাবে মিশিতে পারে না; সুতরাং অক্লেশেই বুঝাযায় সংস্কৃতের সহিত ইহার অতি নৈকট্য সম্বন্ধ। সংস্কৃত যখন ধূলিশয্যায় —মুমূর্ষদশায় পতিত, বাঙ্গালা সেই সময়েই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে ও মাতার অক্ষমতা প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা সহোদরার অঙ্কে প্রতিপালিতা হইয়াছে; সুতরাং সহোদরার নিকট ইহা বিশেষ রূপে ঋণী। (প্রাকৃত ইহার প্রতিপালিকা বলিয়া মান্য পাইতে পারে—মাতৃ সদৃশী আখ্যা পাইতে পারে—মাতৃস্থানীয়াও হইতে পারে কিন্তু মাতা হইতে পারে না।) প্রাকৃত, জ্যেষ্ঠা কন্যা হইয়াও মাতার সমুদায় অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইতে পারে নাই; তাহার কারণ প্রাকৃত, সংস্কৃতের যৌবন কালের কন্যা; সুতরাং অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠা—নিজের অলঙ্কারেই অলঙ্কৃতা ও নিজের সৌন্দর্য্যেই ভূষিতা; তাহার মাতৃদত্ত অলঙ্কার লইবার প্রয়োজন হয় নাই; কাজেই পরিশেষে মাতার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বাঙ্গালাই তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়াছে; সেই জন্যই বাঙ্গালা ভাষা কোমলতা পূর্ণ— মধুরিমাময়।

বাঙ্গালা ভাষা কোমল হইবার আরও নানা কারণ আছে; আমরা দেখাইয়াছি সে সময়ের নিশ্চেষ্ট সমাজের উপযুক্ত ভাষা বাঙ্গালা এবং এক্ষণে দেখাইব বঙ্গদেশ পৃথিবীর যে স্থানে অবস্থিত তাহাতে এইরূপ কোমলতাপূর্ণ ভাষা হওয়াই স্বাভাবিক, না

হওয়া অনৈসর্গিক। দেশের প্রকৃতি অনুসারে জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া থাকে; যে দেশের জলবায়ু যেরূপ, সে দেশের জাতীয় চরিত্রও তদনুরূপ। যে দেশে অতিকষ্টে আহারীয় অর্জ্জন করিতে হয়, সে দেশের লোক স্বাভাবিক পরিশ্রম সহিষ্ণু—সাহসী ও বিগ্রহপ্রিয় হইয়া থাকে; আর যে দেশের প্রকৃতি অতি অল্প আয়াসে প্রচুর আহারীয় প্রদান করে, সে দেশের অধিবাসীগণ সহজেই বিলাসী—ধীর প্রকৃতিক ও মৃদুস্বভাব হইয়া থাকে। দেশের জলবায়ুভেদে লোকের প্রকৃতিভেদ হয়; পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন দেশভেদে জীবজগৎ ও ঔদ্ভিদিক জগতের তারতম্য হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের কোন উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মায় না; আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাহা জন্মে শীত প্রধান দেশে তাহা সেরূপ হয় না। সমান প্রকৃতিক স্থান হইলেই সেই সেই স্থানের ঔদ্ভিদিক সংস্থানও সমান হইয়া থাকে; এই জন্যই হিমালয় প্রদেশে সকল প্রকার বৃক্ষ লতাই পরিদৃষ্ট হয়; এখানে শীতাতপ উভয়ই আছে এইকারণ বশতঃই এদেশে নিরক্ষ স্থিত ও তুষার মণ্ডিত দেশের উদ্ভিদ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই শীতাতপ ভেদ জন্যই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের কোন পশু শীত প্রধান দেশে তিষ্ঠিতে পারেনা; তিষ্ঠিলেও ভিন্ন প্রকৃতিক হইয়া পড়ে বা সেই দেশে অবস্থানের অনুরূপ হয়। যৎকালে দেশভেদে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে এইরূপ প্রভেদ দেখা যাইতেছে তখন যে মনুষ্য জগতে এরূপ কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না তাহার কারণ কি? গ্রীষ্ম প্রধান দেশজাত একজন লোক যে শীত প্রধান দেশে বাস করিলে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইবে না তাহার হেতু কি? আমাদের মনে হইতেছে

আমাদের জনৈক বিলাতস্থিত বন্ধু একবার লিখিয়া ছিলেন "যে এদেশের (ইংলণ্ডের) জল বায়ু এরূপ উপাদানে গঠিত যে কোন লোক নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না ; তাহাকে কোন না কোন কার্য্য করিতেই হইবে ; রাস্তায় যাইয়া দেখ কেহই ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে না—সকলেই ছুটা ছুটী করিতেছে ; এ দেশের প্রকৃতি এরূপ যে কেহই ধীরে ধীরে বাবুয়ানা চলনে চলিয়া যাইতে পারেনা। সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছে।" তাই ইংলণ্ডের এত উন্নতি; আবার সেই ইংরাজ যখন ভারতক্ষেত্রে, বঙ্গভূমে পদার্পন করেন তখন আর একরূপ হইয়া দাঁড়ান। তখন আর তিনি পরিশ্রমী নহেন বঙ্গবাসীর ন্যায়,বিলাস ও অলসের দাস হইয়া পড়েন ; সুতরাং এরূপ হইবার যে কিছুই কারণ নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না ; এবং আমরা জল বায়ুকেই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। সূর্য্যের সহিত দেশের প্রকৃতির অতি নৈকট্য সম্বন্ধ ; যে দেশ সূর্য্য হইতে যতদূরে অবস্থিত সে দেশের লোক তত সাহসী ও পরিশ্রম সহিষ্ণু ; সেই জন্যই দেখিতে পাই উত্তর দেশস্থিত জাতি সকলই চিরকাল ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তর দেশের লোকগণই পুরাকাল হইতে দক্ষিণ স্থিত দেশ সকল আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছে ও করিতেছে। তবে অতিশয় কিছুই ভাল নহে ; সেই জন্যই অত্যন্ত গ্রীষ্ম বা অত্যন্ত শীত ভাল নহে ; এই দুয়েরই সমতা হওয়া আবশ্যক ; অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রদেশে বা অতিশয় শীত প্রধান দেশে লোকে সহজেই নিশ্চেষ্ট, অলস ও কার্য্যাক্ষম হইয়া পড়ে।

সূর্য্য হইতে দূরস্থিত দেশ সকলের অধিবাসীগণ যেরূপ

স্বাভাবিক সাহসী ও বিগ্রহ প্রিয় ও নিকট বাসী গণ কোমল স্বভাব ও অলস, ভাষা সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। উত্তরস্থিত ভাষা সকল কঠিন দুরুচ্চার্য্য শ্রবণ অসুখকর ও বিরস, দক্ষিণ দেশের ভাষা সকল কোমল—শ্রবণ সুখকর—সরস ও সুমিষ্ট। বৈদিক ভাষা উত্তর দেশের ভাষা ; যৎকালে আর্য্য পিতামহগণ উত্তর দেশ হইতে ভারতে আগমন করেন উহা সেই সময়ের ভাষা, সুতরাং উহা কঠিন ও বিরস। সংস্কৃত তাঁহাদের অনেকদিন দক্ষিণ দেশে বাস করিবার পর উদ্ভূত ; ইহা দক্ষিণ দেশের ভাষা এইজন্য ইহা শ্রবণ তৃপ্তিকর ও সুমিষ্ট আর বাঙ্গলা ভাষা গ্রীষ্ম ও সম মণ্ডলের মধ্যস্থিত দেশের ভাষা এইজন্য ইহা আরও সরস—আরও কোমল আরও সুমিষ্ট। দেশের সংস্থান অনুসারে ভাষার এইরূপ প্রভেদ প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা ফরাসী ভাষা কোমল ও সুখকর, আবার ফরাসী ভাষা হইতে ইটালির ভাষা সরস ও সুমধুর ; লাটিন অপেক্ষা গ্রীক শ্রুতি সুখ উন্মেষক। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই উত্তর দেশস্থিত ভাষা অপেক্ষা দক্ষিণ দেশীয় ভাষা সুমিষ্ট ও সুমধুর। তবে দুই একস্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায় ; আরবী ভাষা দক্ষিণের ভাষা হইলেও দুঃশ্রাব্য ; মাস্কাউ উত্তর দেশস্থিত হইলেও তাহার ভাষা মধুর ও সুশ্রাব্য ; আবার মহারাষ্ট্রীর ভাষা দক্ষিণ দেশের ভাষা হইলেও বাঙ্গালা অপেক্ষা নিরস ও কর্কশ ; কিন্তু ইহার অন্য কারণ আছে। যাহা হউক এই সকল প্রাকৃতিক ও পূর্ব্বোক্ত সামাজিক কারণ বশতঃই বাঙ্গালা ভাষা এতাধিক সরস—সরল—কোমল ও মধুর হইয়াছে ; বঙ্গভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বলিয়াছি ইহা জয়দেবের পূর্ব্বেই সৃষ্ট

হইয়াছে; জয়দেবের সময় ইহার কুমারী অবস্থা। জয়দেব সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষারই প্রথম কবি; ভেনারেবল বিড সাহেব যেরূপ লাটিনে গ্রন্থ লিখিলেও ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম লেখক বলিয়া মান্য পাইয়াছেন; আমাদের জয়দেবও সেইরূপ।) জয়দেব বীরভূম জেলার অধিবাসী ছিলেন; বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার সময় সরল বাঙ্গালা ভাষা কথোপকথনের ভাষা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়—কেননা তাঁহারই কিছুদিন পরে সেই স্থানেই আমরা সরল বাঙ্গালায় গীতি লেখক চণ্ডীদাসের দর্শন লাভ করি, জয়দেব চণ্ডীদাস অপেক্ষা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই তিনি সংস্কৃত বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন, আর চণ্ডীদাস তত পণ্ডিত ছিলেন না, তাই তিনি সরল বাঙ্গালায় গীতি লিখিয়াছেন, কদাচিৎ ব্রজভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। জয়দেব বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি; এক্ষণে দেখিতে হইতেছে তিনি কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই তিনি মহারাজ লক্ষণ সেনের সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। লক্ষণ সেন ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহা হইলেই জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ও বাঙ্গালা ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

জয়দেবের সময় অতিক্রম করিলে আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কালে উপস্থিত হই। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কোন সময়ের লোক; তাহার অনুধাবনা করিলে আমরা দেখিতে পাই তাঁহারা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন; বিদ্যাপতি শিবসিংহ নামক নরপতির সভায় ছিলেন; প্রমানীকৃত হইয়াছে

শিবসিংহ মিথিলার অন্যতম অধিপতি। বিদ্যাপতি স্বীয় রচিত বহুল পদাবলীতে এই শিবসিংহ ও তৎপত্নী লছিমা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন বিদ্যাপতি মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু এ কথায় আমরা আস্থা সম্পন্ন হইতে পারি না; বিদ্যাপতি ব্রজ ও মৈথিল ভাষাতে বহুল পদাবলী রচনা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ইঁহারা তাঁহাকে মৈথিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু সামান্য মাত্র অনুধাবনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি মৈথিল ছিলেন না এবং মিথিলা তাঁহার পূর্ব্ববাসস্থান ছিল না। বঙ্গদেশ তাঁহার বাসস্থান ছিল। এস্থলে এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে তিনি যদি বঙ্গদেশীয়ই ছিলেন তাহা হইলে তাঁহার অধিকাংশ গীতি ব্রজ বা মৈথিল ভাষায় হইবার তাৎপর্য্য কি? ইহার কারণ নির্ণয় করা দুরূহ নহে; বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলে তাঁহার বাঙ্গালা ভাষায় অধিকার থাকা অসম্ভব; তাঁহার সময়ে মুসলমানগণ এ দেশের অধিপতি; মুসলমান রাজত্ব কালে পারসীক ভাষাই লাভকরী ও রাজভাষা ছিল; এ দেশীয় সাধারণ লোকে লাভকরী বিদ্যারই অনুশীলনা করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রাধান্য অব্যাহত রাখিবার জন্য যথা- পূর্ব্ব সংস্কৃত শাস্ত্রেরই আলোচনা করিতেন। বাঙ্গালা ভাষার সেই বাল্যাবস্থা—সেই অল্পে অল্পে বিকশিত হইতেছে সেই উহা সামান্য মৃদু প্রবাহী বিলের ন্যায়, কঙ্কালপূর্ণ ভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে মাত্র; তখন ইহাতে মধুরতা ছিল না—গভীরতা ছিল না; সুতরাং তখন তাহা কোন বিদেশীয় পণ্ডিতের আলোচ্য ভাষা হয় নাই। বিদ্যাপতির পূর্ব্বে কোন প্রকৃত বাঙ্গালা লেখক ছিলেন না; সুতরাং তিনি

দূরস্থিত বিদেশীয়, অজ্ঞাত ভাষা শিক্ষা করিবেন কি প্রকারে? আবার তখন আজি কালিকার ন্যায় এক মুহূর্ত্তে বর্দ্ধমান হইতে মিথিলা যাওয়া যাইত না; কাজেই সে দেশের সহিত এদেশের কোন বিশেষ সংস্রব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তদানীন্তন সাধারণ মৈথিলগণের বঙ্গদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান একণকার মৈথিলগণ অপেক্ষা কম ছিল বলিয়াই বোধ হয়। ইতর লোকে বাঙ্গালাদেশের নামও জ্ঞাত ছিল কি না সন্দেহ এবং ভদ্রলোকে ইহার নাম পরিজ্ঞাত থাকিলেও ইহার কোন খোজ খবর রাখিতেন কি না বলা যায় না। সুতরাং যে দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান এত অল্প—সেই অজ্ঞাত দেশের—অজ্ঞাত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মৈথিল বিদ্যাপতি কেন এত আয়াস স্বীকার করিবেন? আবার তাঁহার সময় বাঙ্গালাভাষা সেই বিকশিত হইতেছে মাত্র—লোকে বাঙ্গালায় স্ব স্ব মনের ভাব প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে মাত্র,—তখন ভাষা শিক্ষা করিবার কোন প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। বাঙ্গালা শিক্ষা করিবার এতাদৃশ বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বিদ্যাপতি কিরূপে এই বিদেশীয়—বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিবেন; আবার শুধু শিক্ষা নহে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম কবি বলিয়া মান্য পাইবেন? যে ভাষায় পূর্ব্বে কোন গ্রন্থই থাকে নাই—কোন রচনাই থাকে নাই এমন একটী বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাকে নূতন অলঙ্কার দেওয়া কি সহজ ব্যাপার, এবং এরূপ দৃষ্টান্ত কি অন্য কোন জাতীয় সাহিত্যে আছে? যাহা হউক আমরা কোন মতেই বিদ্যাপতিকে মৈথিল বলিতে সম্মত নহি। তবে তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে অনেক দিন ছিলেন ইহা সত্য। পূর্ব্বকালে বঙ্গীয় পণ্ডিতগণ মিথিলায় শাস্ত্রাধ্যয়ন

করিতে যাইতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; তবে পক্ষধর মিশ্রের পর সময় হইতে যখন পণ্ডিত কেশরী রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া আপন প্রভা বিকীর্ণ করেন সেই সময় হইতে দুই একজন মৈথিল পণ্ডিতও বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন এরূপ জানা যায়; কিন্তু কবি বিদ্যাপতির সময়ে মৈথিলগণ এদেশে প্রায়ই আসিতেন না; তখন বঙ্গদেশ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং বিদ্যাপতির সে সময়ে মিথিলা হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে অপরিচিত বিদ্যাশিক্ষা করা অসম্ভব; বরং বঙ্গবাসী হইয়া মিথিলায় যাওয়াই সম্ভব; এবং বিদ্যাপতি তাহাই করিয়াছিলেন; তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বিদ্যা শিক্ষার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করেন। সেখানে অনেক দিন অবস্থানের জন্য মৈথিল ভাষাতেও জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গালা তাঁহার মাতৃভাষা; সুতরাং তাঁহার সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মৈথিল এই তিন ভাষাতেই অধিকার লাভ করা সম্ভব। এবং তাই তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও মৈথিল এই তিন ভাষাতেই কবিতাদি লিখিয়াছেন। মিথিলায় তিনি অনেক দিন বাস করেন—মিথিলাতেই তাঁহার উচ্চ শিক্ষা লাভ—এবং মৈথিল রাজই তাঁহার আশ্রয় দাতা; সুতরাং মৈথিল ভাষাতেও তাঁহার অনেক গীতি রচিত না হইবে কেন? আবার বাঙ্গালা তাঁহার চিরাভ্যস্ত ভাষা—বাঙ্গালাতেই তিনি প্রথম কথা কহিতে শিখিয়াছেন—বাঙ্গালাই তাঁহার কৌমার ও যৌবন কালের ভাষা সুতরাং বাঙ্গালাতে রচিত পদও নিতান্ত অল্প সংখ্যক নহে। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতি বিশুদ্ধ মৈথিল, কিন্তু তিনি সেই গুলি বঙ্গবাসীর সুগম করিবার জন্য সেই সেই

গীতি বাঙ্গালাতেও রচনা করিয়াছেন; এতদ্দৃষ্টে কি বঙ্গবাসীর সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি জানা যাইতেছে না। এই স্থানে যদি কেহ বলেন যে বিদ্যাপতির সময়ে বঙ্গভাষা সম্পূর্ণ রূপে সৃষ্ট হয় নাই, সেই পৃথক হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র তাহাতে আমরা বলি যদি বঙ্গভাষা সে সময়ে সৃষ্ট না হইয়া থাকে তাহা হইলে বিদ্যাপতির সম সাময়িক কবি চণ্ডীদাস কি প্রকারে প্রায় তাঁহার যাবতীয় কবিতাই বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচনা করিতে সমর্থ হইলেন? বাঙ্গালাভাষা তখন সম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট হইয়াছে তবে বিদ্যাপতি উপরোক্ত নানা কারণ বশতঃ নানাবিধ ভাষায় লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই ব্রজভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; তাহার কারণ আছে; ইহারা উভয়েই শ্রীমদ্ভাগবৎ বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-ব্রজলীলা বর্ণনা করিয়াছেন; ব্রজলীলা বর্ণন ব্রজভাষায় বড় মধুর লাগে; তাই তাঁহারা বাঙ্গালার সহিত ব্রজভাষা মিশ্রিত করিয়াছেন।

আমরা দেখাইলাম বিদ্যাপতি বঙ্গবাসী ছিলেন; মিথিলা তাঁহার জন্মস্থান ছিল না; তবে তিনি মিথিলায় বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে পৃথক হই-তেছে সেই সময়ে বিদ্যাপতির জন্ম, সুতরাং তিনি হিন্দীমিশ্রিত বাঙ্গালায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহা একদেশদর্শী লোকের উক্তি বলিয়া বোধ হয়; কেন না যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষাতে লিখিলেও কতক-গুলি গীতি বিশুদ্ধ বাঙ্গালাতেও লিখিয়াছেন এবং চণ্ডীদাস তাঁহার সম-সাময়িক কবি হইয়াও কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় গীতি

রচনা করিয়াছেন, তখন বাঙ্গালা ভাষা সেই উৎপন্ন হইতেছে কি প্রকারে বলিব? তবে একথা প্রামাণিক যে সপ্তম শতাব্দীতে যৎকালে চীন দেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্গ এদেশে আগমন করেন তখন বাঙ্গালা বলিয়া কোন ভাষা ছিল না; তিনি বলিয়াছেন মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত প্রায় একই ভাষা প্রচলিত; কিন্তু আমরা বলি তিনি বিদেশীয় লোক; মগধ ও বাঙ্গালা দেশে এক ভাষা প্রচলিত থাকিলেও যে তখন তাহার মধ্যে স্থানভেদে কোন অবান্তর ভেদ হয় নাই, তাহা তিনি কি প্রকারে জানিবেন? আরও তিনি বলিয়াছেন, আসাম ও উৎকলের ভাষা বাঙ্গালার ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এক্ষণেও সেই ভিন্নতাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ও মৈথিল প্রায় এক রকমের ভাষা; বাঙ্গালা ও মৈথিল অক্ষরে অতি অল্পই প্রভেদ; সুতরাং তাহারা যে একজন বিদেশীয় লোকের কর্ণে ও চক্ষুতে সমান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা বলিয়াছি জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালাসাহিত্যের কুমারী কাল; আমরা এক্ষণে হুয়েন্থসাঙ্গের কথা হইতে প্রমাণ করিব যে বাঙ্গালা ভাষা সপ্তম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমরা উপরে বলিয়াছি, মিথিলা ও বাঙ্গালার ভাষা ও অক্ষরে অতি অল্পই প্রভেদ; তাহা একজন বিদেশীয় ভ্রমণকারীর পক্ষে সমান বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া অসম্ভব নহে। আবার তিনি যখন বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্তস্থিত আসাম ও উৎকলের ভাষা বিভিন্ন বলিয়াছেন, তখন মিথিলা হইতে বাঙ্গালার ভাষা যে সামান্যতঃ পৃথক হইয়াছিল তাহাই তাঁহার বলা হইল; কেন না কোন দেশের সীমাভেদে তাহার ভাষার সম্পূর্ণ প্রভেদ ঘটিতে পারে

না; ইহার ক্রম আবশ্যক। একটি শুঁয়াপোকা কখন একেবারে প্রজাপতি হয় না; কার্পাস একেবারে বস্ত্ররূপে পরিণত হয় না; সকল পরিবর্ত্তনেরই ক্রম আবশ্যক; ক্রমিক অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন হইয়া শেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে তাহা মূল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কোন নূতন পদার্থ বলিয়া জ্ঞান জন্মে। কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কৌষিক বস্ত্র, রেসম ও গুটি এই তিনটী পদার্থ দর্শন করিলে তাহাদিগকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়াই অনুমান করিবেন; একটি গুটি ও কৌষিক বস্ত্র সহজ দৃষ্টিতে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু যিনি সমুদায় দেখিয়াছেন তিনি বলিবেন পদার্থ এক কিন্তু ক্রম বিভিন্ন। হুয়েন্থসাঙ্গের দৃষ্টিও এইরূপ; যখন তিনি মগধে ছিলেন, তথায় এক প্রকার ভাষা দেখিয়াছেন; বাঙ্গালায় তাহার অনুরূপ দেখিলেন কিন্তু উৎকলের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। সপ্তম শতাব্দীতে মগধ হইতে উৎকল বা আসাম যাওয়া কিরূপ কষ্টসাধ্য ছিল তাহা সহজেই বুঝা যায়। বিদেশীয় হুয়েন্থসাঙ্গ যে এই অপরিচিত দেশের অপরিচিত রাস্তার উপর দিয়া পদব্রজে গমন করিয়া ছিলেন তাহা অসম্ভব; তাঁহাকে নিশ্চয়ই নৌকাযান আশ্রয় করিতে হইয়াছিল; তাহা হইলে ভাষার ক্রম জ্ঞাত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; তিনি যদি পদব্রজে যাইতেন তাহা হইলে দেশ ভেদে ভাষা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেন, এবং দেখিতেন মগধ হইতে যত দূরবর্ত্তী হইতেছেন ভাষা ততই বিভিন্ন হইতেছে; বঙ্গদেশ, মগধ ও উৎকল বা আসামের মধ্যস্থিত দেশ। যখন হুয়েন্থসাঙ্গ মগধ ও উৎকলের ভাষা পরস্পর ভিন্ন বলিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ক্রম অনুসারে বাঙ্গালা

দেশের ভাষা মাগধী বা মৈথিলী ভাষা হইতে সামান্যতঃ পৃথক হইয়াছিল; সেই পৃথকত্বেই বাঙ্গালা ভাষার জন্ম; এই স্থানে যদি কেহ বলেন হুয়েন্থসাঙ্গ মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি দিয়া উৎকলে গমন করেন; কিন্তু তিনি তাম্রলিপ্তি ও মগধের ভাষা প্রায়ই এক প্রকার বলিয়াছেন; তিনি পূর্ব্বে মগধে অনেক দিন অবস্থিতি করেন ও তাম্রলিপ্তিতেও সমুদ্রগামী পোতের জন্য তাঁহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল; সুতরাং এই উভয় স্থানের ভাষা বিশেষ করিয়া দেখিবার তাঁহার অবসর হইয়াছিল, এই দুই স্থানের ভাষায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকিলে তাহা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া তিনি উভয়স্থানের ভাষা প্রায় এক প্রকার বলিলেন অথচ উৎকলের ভাষা সম্পূর্ণরূপে পৃথক বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি? এতদুত্তরে আমরা বলি তিনি মগধে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া যে, সে দেশের ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে; এবং তিনি মগধ হইতে নৌকাযোগে তাম্রলিপ্তিতে আসিলেও মধ্যে মধ্যে মধ্যদেশবাসীগণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই; এমন কি বোধ হয় তাঁহাকে প্রতিদিনই নৌকাত্যাগ করিয়া কূলে উঠিতে হইত; তাহা হইলে কূলবর্ত্তী লোকগণের সহিত তাঁহার প্রায় প্রতিদিনই পরিচয় হইত; মাগধীভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন থাকিলে এই সকল লোকের কথার সহিত তাহার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি মাগধী বা মৈথিলী ভাষার সহিত বাঙ্গালার অতি অল্পই প্রভেদ; সুতরাং তাহা বিদেশীয় লোকের সহজ জ্ঞাতব্য নহে। যদি কোন এক সুচিত্রকর একটি নিষ্কলঙ্ক সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া

তাহারই পার্শ্বে পার্শ্বে ক্রমাগত ঈষৎ নিকৃষ্ট করিয়া এক একটি সুন্দরীর চিত্র অঙ্কিত করেন; এবং এইরূপ করিতে করিতে যদি সর্ব্বশেষে চিত্রিতা রমণীটী অতিশয় কুৎসিতা হয়; তাহা হইলেও সেই অনুপম সুন্দরীর চিত্র হইতে ক্রমাগত পর পর দর্শন করিয়া আসিলে সেই শ্রেষ্ঠা হইতে নিকৃষ্টা পর্য্যন্ত যে পার্থক্য আছে তাহা কিছুতেই উপলব্ধি হইবে না; কিন্তু শ্রেষ্ঠা হইতে একবারে নিকৃষ্টা দর্শনে তাহাদের পার্থক্য জাজ্বল্যমান। হুয়েন্থসাঙ্গের দৃষ্টিও এইরূপ; তিনি মগধ হইতে তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত নৌকাযোগে নদীর উপর দিয়া গিয়াছেন, এবং প্রতিদিনই নদীতীরস্থ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে; তাহা হইলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার পর পর চিত্র দর্শনের ন্যায় হইয়াছে; কিন্তু পরে তাম্রলিপ্তি হইতে উৎকল যাইবার সময় তাঁহাকে সমুদ্র পথে যাইতে হইয়াছিল সুতরাং তাম্রলিপ্তি ও উৎকলের মধ্যস্থিত কোন স্থানের লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে নাই, কাজেই ভাষার ক্রম তিনি দেখিতে পান নাই; তাই উৎকলের ভাষা তাহার নিকট শ্রেষ্ঠা হইতে একেবারে নিকৃষ্টার দর্শনের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া বোধ হইল। তাই বলিয়াছি সপ্তম শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালা ভাষা অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়া আসিয়াছে। আমরা এক্ষণেও দেখিতে পাই হুগলী জেলার লোকের কথা এক প্রকার—বর্দ্ধমান জেলার কথা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন; মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী স্থানের কথা তাহা অপেক্ষা বিভিন্ন, ক্রমে ঐ জেলারই পশ্চিম প্রান্তে সেই কথা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহা হুগলী বা বর্দ্ধমান বাসীর বুঝিবার পক্ষে কঠিন; সেখানকার ভাষা যেন সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা। হুয়েন্থসাঙ্গের সময়ে যে ভাষার এরূপ

ক্রম ছিল না তাহা কে বলিবে? ও মধ্যস্থিত বাঙ্গালা দেশে যে পার্থক্য হইয়াছিল তাহা হইতেই যে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তাহাই বা না বলিব কেন?

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা দেখিতে গেলে আমরা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উপনীত হই; কেন না রাজা শিবসিংহ প্রদত্ত একটী তাম্র শাসন দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ২৯৩ লক্ষ্মণ সংবতে কবিবর বিদ্যাপতিকে কতকগুলি উর্ব্বরক্ষেত্র প্রদান করেন; রাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন ১১০৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলা করতলস্থ করিয়া যে সংবৎ প্রচলিত করেন তাহাই লক্ষ্মণ সংবৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা হইলেই ১১০৭+২৯৩ এই ১৪০০ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হইতেছি; তাহা হইলে কবিবরের এই ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকাই সম্ভবপর। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে সে সময়ে এদেশের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল। তখন মুসলমানগণ এদেশের প্রভু—বঙ্গভূমি তখন স্বাধীন পাঠানরাজগণের করতলস্থ; তখনকার সমাজ আর জয়দেবীয় সমাজের ন্যায় নিশ্চেষ্ট—গতিহীন—ক্রিয়াহীন নহে; তখন সেই জীবন্মৃত সমাজের মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক বেগ ছুটিয়াছে—যেন সেই অলস ও বাহ্যসৌন্দর্য্যমোহিত সমাজ কর্ম্মঠ হইয়াছে ও অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণকার সমাজ ইন্দ্রিয় পরবশ হইলেও আর ইন্দ্রিয়ের দাস নহে। যেন সমাজ বাহ্য প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ নষ্ট করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির ঈষৎ আভাস পাইয়াছে; জয়দেবের পূর্ব্ব হইতেই লোকের মনে নানাবিধ ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি আসিয়া উপনীত হইয়াছিল; বঙ্গবাসী ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই

বৌদ্ধরাজ, শৈবরাজগণের অধীনে থাকিয়া এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও পুরাণ, তন্ত্রের নানাবিধ কথা শুনিয়া এক প্রকার অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল—ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রায় সকল ধর্ম্মেই আস্থা শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল—সেই ধর্ম্মভাব শূন্য সময়ের কবি জয়দেব। তাই তিনি সাংখ্য-কারের পুরুষ প্রকৃতি ভেদ কবিত্বে প্রকাশক, দার্শনিক ও মহা-কবি ভাগবৎকারের ভক্তিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে লইয়া বিলাস রসে বিভোর—জঘন্য প্রেমের ভিখারী—ইন্দ্রিয়ের দাস—লম্পট স্বভাব কিশোর কিশোরী আঁকিয়াছেন—ইন্দ্রিয় চরি-তার্থের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই আনিয়াছেন—রাধাকৃষ্ণের মিলন যেন লম্পটের লাম্পট্য; আবার সেই জঘন্য চরিত্রের উপরই দেবতার আরোপ করিয়াছেন; ইহাতেই তখনকার লোকের ধর্ম্মভাব অক্লেশেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বিদ্যাপতির সময়ে সমাজ ভিন্ন প্রকৃতিক; এ সময়ে সমাজ আলস্যের দাস ও দুর্ব্বল থাকিলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছে; এ সময়ে রাজা মুসলমান; মুসলমানগণ ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত—অমিত বলবান ও সাহসী; সমাজ রাজার দৃষ্টান্তে অপেক্ষাকৃত বলীয়ান হইয়া উঠিয়াছে; আবার পাঠানরাজগণ ধর্ম্ম পিপাসু—হিন্দু সমাজে মহম্মদের বিজয় কেতন উড়াইবার চেষ্টা তাহাদের বলবতী; সুতরাং সে সময়ে সমাজ দোলায়-মান। হিন্দুগণ পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ ধর্ম্মের তাড়নে এক প্রকার ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল তাহার উপর মুসলমান-গণের প্রবল ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তাঁহাদের চক্ষের উপর নৃত্য করিতে লাগিল; হিন্দুসমাজ একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল; তখন কাতর স্বরে একবার সনাতন ধর্ম্মের দিকে চাহিল; কিন্তু

লোকে জয়দেবের লম্পট শ্রীকৃষ্ণে নিমজ্জিত—সেই ইন্দ্রিয় পর শ্রীকৃষ্ণই তখন সকলের আরাধ্য দেবতা; জয়দেবের শ্রীকৃষ্ণে সার কিছুই নাই—তাই তাঁহার আরাধনায় লোকে নিশ্চেষ্ট ও ধর্ম্মহীন। আবার তখন সেই ইন্দ্রিয় সেবক শ্রীকৃষ্ণই লোকের মনে এরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে তাহা আর কিছুতেই সমাজ হইতে উৎপাটিত হইবার নহে। সমাজ যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত; সেই সময়ের ঈষৎ বলে বলীয়ান কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস; লোকে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণে নিমজ্জিত; তাই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, জয়দেবের সেই বিলাস রসে রসিক শ্রীকৃষ্ণকেই দেবতা বলিয়া তুলিয়া লইলেন,—কিন্তু তাহাতে আপনাদের কিঞ্চিৎ প্রাণ মিশ্রিত করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিলেন না, তাঁহারা তাঁহার সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ বুঝিলেন; সুতরাং তাঁহাদের কৃষ্ণ চরিত্রে বাহ্য মোহনীয় ভাব রাখিলেও তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির রঙ্গ চাপিয়া দিলেন, কাজেই ইহাদের কৃষ্ণ ভিন্ন প্রকৃতিক হইয়া দাঁড়াইল। জয়দেবের সময় সুখের সময়—ভোগ তৃষ্ণার সময়—তখন বঙ্গদেশ যেন রাজাগণের শাসনে সুখে শয়ান, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের সময়ে বিধর্ম্মীগণ প্রভু—সুতরাং পরাধীনতার দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা তখন সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; ও সেই সঙ্গে বঙ্গদেশে দুঃখ প্রবেশ করিয়াছে। সুখের সময় লোকে যাহা দেখে তাহাতেই সন্তুষ্ট—তাহাতেই প্রফুল্ল হয়, তখন কাহারও ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুখ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না—সকলই সুখময়—সুতরাং বাহ্যসৌন্দর্য্যই তখনকার প্রীতিপ্রদ। কিন্তু বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়; এ সময়ে সুখ বঙ্গদেশ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হই-

য়াছে; বাহ্য সকল পদার্থেই তখন দুঃখের অন্ধকার ছায়া আসিয়া পতিত হইয়াছে; তাই এ সময়ে সুখ বাহির করিতে হইলে বাহিরে বাহির হয় না ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। এবং এই জন্যই লক্ষ্মণ সেনের সময় বাহ্য শোভায় মোহিত ও ভোগ তৃষ্ণায় নিরত জয়দেব, আর অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ কিয়ৎ-পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই সময়ের কবি। আমরা দেখাইয়াছি জয়দেবের সময়ে জাতীয় জীবন এক প্রকার শিথিল হইয়া গিয়াছে, বিদ্যাপতির সময়ে, পীড়ন ও দুঃখের ভয়ানক নির্য্যাতনে সেই নির্ব্বাপিত জাতীয় জীবনের পুনরুদ্দীপন হইতেছে। বিদ্যাপতির সময়ে জাতীয় জীবনে তড়িদ্বেগ সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তিনিই প্রথম সেই তড়িতের আভা দেখিতে পান ও দুঃখের কালে—দুঃখের গীত গাহিয়া সেই আভার প্রতি সকলেরই হৃদয় আকর্ষণ করেন। তাঁহার সেই হৃদয় আকর্ষণের অনিবার্য্য ফল, পর সময়ে চৈতন্য দেব। বিদ্যাপতি যে জাতীয় জীবনের গতির প্রথম শিখা, তাহারই চরম ফল চৈতন্য দেব। বিদ্যা-পতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ধর্ম্মের জোহন (John the Baptist); প্রটেষ্টাণ্টগণের উইক্লিফ, বৌদ্ধ ধর্ম্মের বৃহস্পতি ও পার্কারের পূর্ব্বে রামমোহন। তাঁহাদের প্রভাবেই বঙ্গদেশে চৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; চৈতন্য দেব যে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইবেন তাহা বলিবার অগ্রগামী দূত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস; সুতরাং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে যাহা থাকা সম্ভব জয়দেবে তাহা থাকিবে কেন?

জয়দেবে কেবল ভোগতৃষ্ণা—কেবল বাহ্য শোভা; আদি রসের ভিতর যত রত্ন আছে, জয়দেবের তৎসমুদায়ই উপ-

করণ—ভাষার মধ্যে যতশব্দ কুসুম আছে সে সকলই তাঁহার মালায় বিরাজমান—পৃথিবীতে যত কোমল ভাব আছে তাহা তাঁহার মালায় বিজড়িত—বাসন্তীয় মৃদু মলয় হিল্লোল তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্বত্রই বিরাজমান; সুতরাং তাঁহার কৃষ্ণ-রাধিকা বাহ্যিক প্রেম লইয়াই ব্যস্ত—কখন প্রেমের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই—তাঁহাদের প্রেম যেন লালসা সম্ভূত—রূপজ মোহে মোহিত, তাহা হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ পথ পায় না; যেন সে প্রেমে কিছুমাত্র গভীরতা নাই। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসিতে বিলম্ব করিতেছেন, রাধিকার শয্যা কণ্টকী হইল; তিনি একবার উঠেন, একবার বসেন; একবার শয়ন রচনা করেন—আরবার বাহিরে যাইয়া দেখেন; কখন বা কাহারও পদ শব্দে চমকিয়া উঠেন—কখন বা সখীকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, আবার আসিতে দেখিলেই মান করিয়া বসেন—পায় ধরিয়া সাধান; এই সকল চিত্ত প্রেমের বাহ্যভাব মাত্র। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের রাধিকা এমন অবস্থায় ছুটাছুটি করেন না; তিনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন—মর্ম্মন্তুদ চিন্তায় জর্জ্জরিত হন—তাঁহার বাহ্য দৃষ্টি লোপ হয়—তাঁহার কথা অন্তঃস্থলের নিভৃত প্রদেশে অবস্থিত হয় ও তথা হইতে এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস স্বরূপ বাহির হয়। প্রেমের এই গভীর উচ্ছ্বাস লোকের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করে। অন্তঃস্থলের ভাব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন আঁকিয়াছেন এমন আর কই? তাঁহারা দুঃখময় সমাজে বাস করিয়া যেমন দুঃখের কথা বলিয়াছেন এমন আর দেখিতে পাই না।

বিদ্যাপতির রচনা হিন্দী বহুল; তিনি তাঁহার রচিত পদাবলীতে বহুল ব্রজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাস

তাহা করেন নাই। বিদ্যাপতির কতিপ.
থাকিলেও তিনি যেন হিন্দী লেখক ও চণ্ডী.
হিন্দী থাকিলেও তাঁহাকে সহজ দৃষ্টিতেই বঙ্গীয় লে
প্রতীয়মান হয়; এবং বোধ হয় এই জন্যই বিদ্যাপতিকে
কেহ মৈথিল কবি বলিয়াছেন। যাঁহারা বিদ্যাপতিকে মৈথি.
কবি বলেন তাঁহারা আপনাদের মত সমর্থনার্থ আরও বলেন
যে বিদ্যাপতি সমুদায় কবিতাই মৈথিল ভাষাতেই লিখেন,
তবে পরে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার রচনা সকল সতত
আলোচিত হইবার জন্য, তাঁহার কতিপয় গীতি বাঙ্গালায় হইয়া
গিয়াছে; আবার এমনও কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বিদ্যা-
পতির সময়ে বাঙ্গালাভাষা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্ট হয় নাই; সেই
মৈথিল ভাষা হইতে উৎপন্ন হইতেছে; তাই তাঁহার রচনায়
এতাধিক ব্রজ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়; এতদুত্তরে আমরা
বলি যদি বিদ্যাপতি তাঁহার সমুদায় পদ মৈথিল ভাষাতেই
রচনা করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণের সতত
আলোচনা জন্য তাঁহার গীতির কতিপয় মাত্র বঙ্গ ভাষায়
হইত না; বৈষ্ণবগণ তাঁহার সমুদায় গীতের আলোচনা করি-
তেন; তাহা হইলে তাঁহার সমুদায় পদই বাঙ্গালা ভাষায় হইয়া
যাইত। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে, বিদ্যাপতি কেবল
মৈথিল ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন নাই। তিনি বর্ন্স
(Burns) প্রভৃতি স্কটলণ্ডীয় কবির ন্যায় যেমন বিজাতীয়
ভাষায় লিখিয়াছেন, সেই রূপেই স্বজাতীয় ভাষাতেও লিখিয়া-
ছেন। যাঁহারা বিদ্যাপতিকে বঙ্গভাষার উৎপত্তি কালীন কবি
বলেন তাঁহাদিগকে আমরা বলি, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে
বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম-সাময়িক হইয়া, চণ্ডীদাস বিশুদ্ধ

...সমুদায় কবিতা লিখিতে সমর্থ হইতেন ...বটে চণ্ডীদাসেরও অনেক কবিতায় ব্রজশব্দ ...; কিন্তু তাহার অন্য কারণ আছে; আমরা পূর্ব্বে ...হ ব্রজলীলা ব্রজভাষায় যেমন মধুর লাগে এমন আর ...কান ভাষাতেই নহে; এই জন্যই তিনি সামান্য মাত্র ব্রজশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; তিনি বিদ্যাপতির ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন না; সুতরাং বিদ্যাপতির ন্যায় বহুল বিদেশীয় শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনেক পরবর্ত্তী কবি সকলও এই নিমিত্ত বহুল ব্রজশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ফলতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভাষার উৎপত্তি কালীন কবি হইলে তাঁহাদের উভয়ের রচনায় এতাধিক পার্থক্য হইত না; উভয়ের রচনা প্রায় সমান হইয়া যাইত। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি, বঙ্গভাষা সপ্তম শতাব্দী হইতে অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিকসিত হইয়াছে; বিদ্যাপতির সময় ভাষার অনেকটা বলাধান হইয়াছে; তবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনায় এত পার্থক্য হইবার কারণ, বিদ্যাপতি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, চণ্ডীদাস তাহা ছিলেন না; সুতরাং বিদ্যাপতির রচনা গভীর ও ব্রজশব্দ বহুল এবং চণ্ডীদাসের রচনা তরল ও ব্রজশব্দ বিরল; বিদ্যাপতির রচনা প্রায়শঃ ছন্দ পতন দোষ বিবর্জ্জিত, চণ্ডীদাসের প্রায়ই ছন্দদোষে দুষ্ট; কিন্তু বিদ্যাপতির রচনা শিক্ষিত পক্ষীর-শিক্ষিত মধুর কণ্ঠস্বরের ন্যায়—চণ্ডীদাসের রচনা বন্য বিহঙ্গমের স্বাভাবিক-সুন্দর-মধুর উচ্ছ্বাস।

এ স্থানে আর একটী কথা বলাও বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যে সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

আপনাদের প্রভায় বঙ্গভূমি আলোকিত করিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই ইংলণ্ডীয় প্রথম কবি জিয়োফ্রি চসর (Geoffrey Chaucer) তাঁহার কাণ্টরবরি (Canterbury Tales) কাব্য লিখিয়া ইংলণ্ড মাতাইতেছিলেন ও ইংরাজী সাহিত্যের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছিলেন। যে সময়ে ইংরাজী সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, প্রায় সেই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি; যে সময়ে ইংলণ্ড কবির মুখ প্রথম সন্দর্শন করিয়াছেন, বাঙ্গালাও ঠিক সেই সময়েই গীতিকাব্যের রূপে মোহিত হইয়াছেন, কিন্তু এই দুই সাহিত্যের বয়স সমান হইলেও কি ইহাদের তুলনা হইতে পারে? কোথা কাব্য দর্শন বিজ্ঞানের আধার ইংরাজী সাহিত্য আপনার অলঙ্কারে জগৎ মাতাইতেছেন, আর কোথায় নিরলঙ্কতা বঙ্গীয় সাহিত্য চিরদিন একটানায় বহিতেছেন; ইংরাজী সাহিত্যে নাই এমন কোন বিদ্যাই নাই—আর বঙ্গীয় সাহিত্যে এক গীতিকাব্য ভিন্ন গৌরব করিবার আর কিছুই নাই; কিন্তু ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। ইংরাজী ভাষা যে দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহা স্বাধীন জাতির স্বাধীন ভাষা; আর আমাদের বঙ্গভাষা জন্মগ্রহণের সময় হইতেই প্রায় পরাধীনের দুঃখের ভাষা; ইংলণ্ডের ভাষা প্রতি পদ-বিক্ষেপেই আশা ও উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছে—আর বঙ্গভাষা প্রতি পদক্ষেপেই নিরাশা ও নিরুৎসাহের জীবন্ত মূর্ত্তি পরিলক্ষিত করিয়াছে। তাই ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের সর্ব্বত্রই সুখের মূর্ত্তি—আহ্লাদ-উৎসাহের স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ—আর বাঙ্গালা সাহিত্য কেবল দুঃখের ভীষণ আকার ও পীড়নের হৃদয়দ্রবকারী উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। যে জাতি প্রথম হইতেই পরপদ লেহনে প্রমত্ত সে জাতির উন্নতি কোথায়?

সুতরাং জাতীয় জীবন যখন নিতান্ত শিথিল, তখন জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ আকাশ কুসুমবৎ অলীক। ইংলণ্ড চিরকাল স্বাধীনতার খনি—ইংলণ্ডের জাতীয় জীবন চিরদিন বিশেষ স্ফূর্ত্তিশালী; সুতরাং পরপদ লেহনে প্রমত্ত বাঙ্গালীর ও আত্ম-গৌরবে গৌরবান্বিত ইংরাজের সাহিত্য এক সময়ে জন্ম গ্রহণ করিলেও সমান হইবে কেন? তবে আমরা এক্ষণে যে কালে সমুপস্থিত হইতেছি, সেই সময়ে বঙ্গদেশ পরাধীনতার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিলেও, ভক্তির মাহাত্ম্যে সামান্য মাত্র উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—একবার আহ্লাদ উৎসাহে নৃত্য করিয়াছিল—একবার সব ভুলিয়া, সকলকেই সমান—সকলকেই আপনার বলিতে পারিয়াছিল—তাই সে সময়ে ভাষার একটু উন্নতি দেখি। বিদ্যাপতিরই কিছুদিন পরে ভক্তিমাহাত্ম্যে বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ের বন্ধন কিয়দংশে উন্মুক্ত হইয়াছিল; কিন্তু মানব হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত হইলে, হৃদয়ের গতি বেগবতী হয়—ধর্ম্মের অনুপম উৎসাহে হৃদয় তরঙ্গায়িত হইলে তাহার গতি অতিশয় বলবতী হয়—এইরূপে সামাজিক হৃদয়ের গতি বেগবতী হইলে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যের সৃষ্টি সাধান হয়; বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বিপ্লবের এইরূপ ফল ফলিয়াছিল।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর চৈতন্য দেবের কাল। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে বা ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; এবং সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে সমাজের অবস্থা কি প্রকার ছিল দেখিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সমাজ বিদ্যা-পতির সময়ে সামান্যমাত্র আলোক দেখিতে পাইয়াছে—তখন সমাজে দুঃখ প্রবিষ্ট হইয়াছে—তদানীন্তন সমাজে দুঃখ অন্তঃ

সলিলা ফল্গুরন্যায় ধীরে ধীরে বহিতে ছিল; চৈতন্য দেবের সময়ে সেই অন্তঃস্থিত সলিল বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বঙ্গের প্রতি নগর—প্রতি গ্রাম—প্রতি পল্লী—প্রতি গৃহময় ছড়াইয়া পড়িল; প্রতি গৃহে তাহা আপনার লহরী লীলা দেখাইতে লাগিল; বঙ্গভূমি সেই জল ক্রীড়ায় মোহিত হইয়া গেল—সে তরঙ্গ লীলা আর কিছুতে ভুলিতে পারিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে বিদ্যাপতির সময়ের পূর্ব্ব হইতেই সমাজে ধর্ম্মভাব একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছিল—নানা প্রকার ধর্ম্মের তাড়নে বঙ্গভূমি ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িয়াছিল—বঙ্গভূমি কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধ—শৈব—তান্ত্রিক প্রভৃতি নানাবিধ মত দর্শন করিয়াছিল। কখন বা জ্ঞান কাণ্ড—কখন বা কর্ম্মকাণ্ড প্রবল হইয়া সমাজে ভয়ানক কাণ্ড বাধাইতেছিল; সুতরাং কোন কাণ্ডেই লোকে অধিক আস্থা সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এদিকে মুসলমান ধর্ম্ম প্রবল হইয়া লোকের মন প্রবলরূপে আকর্ষণ করিতেছিল; পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণগন শুধু ধর্ম্ম কেন,সকল বিষয়েই সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন; তাঁহাদের কার্য্যের উপর কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার উপায় ছিলনা। হিন্দু রাজা, ব্রাহ্মণের পদানত—হিন্দুপ্রজা ততোধিক; অন্য সকলেই যেন ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সকলেই ব্রাহ্মণের নিকট অষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ; তুমি কোন অযথা কার্য্য-কর—ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই হইল, পরলোকে তুমি সুখের প্রয়াসী—ব্রাহ্মণের পদ পূজা কর,—তিনি ঈশ্বরকে বলিয়া কহিয়া তোমাকে স্বর্গে স্থান দেওয়াইবেন; ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া তখন কোন কার্য্যই হইত না; ব্রাহ্মণের একাধিপত্য তখন সমাজে এইরূপ প্রবল ছিল। এদিকে মুসলমানগণের বিভিন্ন নীতি; মুসলমানগণও

স্বর্গলাভের অধিকারী কিন্তু তাহারা সকলেই নিজে ঈশ্বরার্চ্চনা করিয়া থাকে; এবং আপনারা এইরূপে উপাসনা করিয়াই ঈশ্বরে লীন হয়। সুতরাং মন হইতে লোকের ভ্রম ঘুচিল—এই সকল দৃষ্টে ব্রাহ্মণের ভয়ানক তাড়ন লোকের অসহনীয় হইয়া উঠিল। এই দোলায়মান সমাজে অনেকে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ইসলাম্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন; আবার অনেকেই স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া মনে মনে তাহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিতেছিলেন—ব্রাহ্মণের উপর সকলেরই বিতৃষ্ণা জন্মিল; কি উপায়ে স্বধর্ম্মে থাকিয়াই স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মচিন্তা করা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবনে সকলেই সযত্ন হইলেন। ইসলাম্ ধর্ম্মের দৃষ্টান্তে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছিল; এদিকে ঐশ্বরিক চিন্তা—পরলোক ভীতি লোকের মনে বরাবর সমান প্রবল; সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়া আপনার ক্রীড়া দেখাইয়াছিল; কিন্তু তান্ত্রিকোপাসনার অত্যাচার অধিক দিন সমাজে স্থায়ী হয় নাই; মহম্মদীয়ধর্ম্মের একেশ্বর বাদের নিকট পৌত্তলিকতা তিষ্ঠিতে পারিল না; লোকের চিত্ত টল টলায়মান; সুতরাং এই সময়ের বিশৃঙ্খল সমাজ সুশৃঙ্খলে আনিবার জন্য গৌরাঙ্গ অবতার প্রয়োজনীয় হইল। বিদ্যাপতির সময় যে অগ্নি অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল, এই সময়ে তাহা একেবারে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; বিদ্যাপতির সময়ে যে একটি নক্ষত্র পূর্ব্বগগণে ঝিকি মিকি করিতেছিল, তাহা চন্দ্ররূপে মধ্যগগণে আসিয়া আপনার উজ্জল প্রভা বিকীর্ণ করিতে লাগিল; চৈতন্যচন্দ্র বঙ্গীয় আকাশে সমুদিত হইলেন। জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড বা যোগকাণ্ড ইঁহার নিকট অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইল; সকল

অনর্থের মূল জাতিভেদ প্রথা তাঁহার নিকট হইতে সুদূরে প্রস্থান করিল; ব্রাহ্মণ-শূদ্র, মহৎ-ক্ষুদ্র ইঁহার নিকট সমান আদরের পাত্র হইলেন—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলকেই তিনি সমান ইচ্ছায় আলিঙ্গন করিলেন; হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সকল তত্ত্বের সার ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন; শ্রীমদ্ভাগবৎ যে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া জগৎ মাতাইয়া ছিলেন—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যাহাতে অনুপ্রাণিত,—তিনি সেই ভক্তির তরঙ্গ লইয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রায় সকল লোকেই ভক্তি-শূন্য হইয়াছিল—এক্ষণে সকলেই ভক্তিস্রোতে গা-ভাসাইয়া দিল। কেবল বঙ্গে নহে, এই সময়ে এবম্বিধ কারণ বশতঃই পঞ্জাবে নানক জন্মগ্রহণ করিয়া শিখধর্ম্মের ভিত্তিসংস্থাপন করিতেছিলেন; আবার সুদূর পশ্চিমে মার্টিন লুথর এই সময়েই পোপের বিরুদ্ধে আপনার জ্ঞানাস্ত্র চালনা করিতে ছিলেন; সুতরাং সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এই সময়ে যেন পৃথিবীময় একটি ধর্ম্ম সংস্কারের বাতাস পড়িয়াছিল।

চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গীয় জাতীয় জীবনও উল্লাসিত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠে, উৎসাহ ও আশা সকলেরই হৃদয় অধিকার করে, সুতরাং এই সময়ের ভাষাও বিশেষ উল্লাসময় ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত। বঙ্গভাষা এই সময়ে বিশেষ পরিপুষ্ট হইবার একটি প্রধান কারণ আছে; ভাগবৎ যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়া যান, চৈতন্যদেব তাহা মহাবৃক্ষে পরিণত করেন, এবং যাহাতে সকল লোকেই তাহার ছায়ায় বসিয়া সুশীতল হইতে পারেন, এইটিই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা; ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই যাহাতে ভক্তির সারমর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হয় এইটিই তাঁহার অন্তরের অভিলাষ; সুতরাং

তাঁহার উপদেশ বাক্য,সকলেরই সহজ বোধ্য হওয়া প্রয়োজনীয় —তিনি যে ভক্তির সার কথা বলিবেন তাহা সকলেরই সমান বুঝা আবশ্যক; সুতরাং পণ্ডিতের ভাষা তাঁহার পোষাইবে কেন? বহুকাল পূর্ব্বে মায়াদেবী সুত ধর্ম্মোপদেশ জন্য যে কারণ বশতঃ পালিভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই কারণ বশতঃই গৌরাঙ্গদেব অনুপম সংস্কৃতবিৎ হইয়াও বাঙ্গালাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; বুদ্ধদেব তদানীন্তন বিশৃঙ্খল আর্য্যসমাজে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গদেব ইদানীন্তন বিশৃঙ্খল বঙ্গীয় সমাজে সেই কার্য্যই করিলেন; বুদ্ধদেব যে জন্য পিতা, মাতা,পুত্র-কলত্র পরিত্যাগ করিয়া সন্নাসী,গৌরাঙ্গও সেই জন্যই স্নেহময়ী মাতা ও প্রণয়িণী পত্নী পরিত্যাগ করিয়া কৌপীন-করঙ্গ-ধারী। আবার বুদ্ধদেব যেরূপে চিরপ্রাধান্য লাভেচ্ছু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণের অবতার বলিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়েন; গৌরাঙ্গদেবও সেইরূপেই নারায়ণের অবতার বলিয়া কথিত এবং সেই রূপেই তাঁহার প্রিয় শিষ্য গোস্বামীগণ, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন; এইরূপেই রঘুনাথদাস গোস্বামী কায়স্থ হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; বুদ্ধদেব ও গৌরাঙ্গের জীবনী ঘটিত এইরূপ সুন্দর সৌসাদৃশ্য আছে। বুদ্ধদেব আপনার ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য মাগধী বা পালি ভাষার আশ্রয় লইয়াছিলেন, চৈতন্য দেবও সকলের সমান বুঝিবার জন্য বাঙ্গালাভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভাষাতেই তিনি ভক্তিতত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন—এবং এই ভাষাতেই তিনি গ্রামে গ্রামে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অনুচরগণও যে এই ভাষার বিশেষ আদর করিবেন ও ইহাতেই নানা স্থানে

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিকই চৈতন্যদেব ও তদীয় নানা শিষ্য-প্রশিষ্য কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা নূতন জীবন লাভ করিয়াছে; যে ভাষা এতদিন ধীরে ধীরে—অন্তরে অন্তরে বহিতেছিল, তাহা এখন দ্বিগুণ উৎসাহে বিশেষ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। সুতরাং এই সময়ে আমরা যত কবি দেখিতে পাই, এমন আর কোন সময়েই নহে; এই সময়ে নবীন উৎসাহে মাতিয়া নানা ব্যক্তি বঙ্গ-ভাষায় কবিতার তরঙ্গ দেখাইয়াছেন; আমরা যত বৈষ্ণব কবি দেখিতে পাই প্রায় তত্তাবৎই এই সময়ের লোক। চৈতন্য চন্দ্রের কিছুদিন পরেই বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য দেবের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; চৈতন্যের জন্ম হইতে শরীর ত্যাগ পর্য্যন্ত তাঁহার যাবতীয় কার্য্যই তাহাতে প্রকটন করিয়াছেন; সুতরাং চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবৎ বৈষ্ণব-দিগের বিশেষ আদরের দ্রব্য; শুধু বৈষ্ণবগণের কেন, ইহা সকলেরই সমান আদরের ধন। যে মহাত্মা বঙ্গ-সমাজের তেমন ভয়ানক উপপ্লবের সময় দারুণ বিপৎপাত হইতে সমাজ রক্ষা করিয়াছিলেন—যিনি কেবলমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন—যিনি অক্লেশে যবন হরিদাসকে ভক্তিমাহাত্ম্যে বশীভূত করিয়াছিলেন ও যবন ভাবাপন্ন রূপ-সনাতন যাঁহার অনুগ্রহে আচার্য্য হইয়াছিলেন—যিনি অবাধে জাতিভেদ প্রথা রহিত—অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করেন সেই মহা-পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত যে গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, তাহা যে সকলেরই সমান আদরের ধন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবৎ কিছু সরল ও বিশদ; কৃষ্ণ-

দাসের চৈতন্য-চরিতামৃত কিছু কঠিন ও জটিল; কিন্তু এ দুয়েরই ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা—হিন্দী নাই বলিলেই হয়। তথাপি রচনায় ইঁহাদের বিশেষ পারিপাট্য কিছুই নাই; ভাষা যেন নিস্তেজ ও প্রায় সামান্য পয়ারেই গ্রথিত; যাহা হউক, ঠিক এই সময়ের ভাষা, বিশেষ বলবতী না থাকিলেও নিতান্ত স্ফূর্ত্তি বা শ্রীহীনা ছিল না; এই সময়েই ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। এই সময়ে ভাষার নানাবিধ আলোচনে আমরা বহু বঙ্গীয় কবির দর্শন লাভ করি। রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক; ইঁহারা সংস্কৃত ভাষার বিশেষ আলোচনা করিলেও, বঙ্গীয় লেখক। রূপ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোঅষ্টাদশ প্রভৃতি কাব্য; উৎকলিকা বল্লী, গোবিন্দ বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, প্রভৃতি স্তোত্র গ্রন্থ; বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব প্রভৃতি নাটক; দানকেলী প্রভৃতি ভানিকা; মথুরামাহাত্ম্য, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, ভাগবতামৃত, ও ভক্তি রসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ রচনা ও সংগ্রহ করিলেও, তাঁহার প্রণীত রিপু দমন বিষয়ে "রাগময়কণ" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিতে পাই। এইরূপ সনাতন গোস্বামী প্রণীত ভাগবতামৃত, হরিভক্তি বিলাস, লীলাস্তব ইত্যাদি নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার প্রণীত "রসময় কলিকা" প্রাপ্ত হই; শ্রীমজ্জীব গোস্বামী বৈষ্ণব তোষিনী প্রভৃতি নানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিলেও বঙ্গভাষায় "করচাই" রচনা করিয়াছেন। এইরূপে এই সময় হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালাভাষা শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। চৈতন্য দেবের পূর্ব্ব হইতেই

বঙ্গদেশে পুনরায় সংস্কৃতের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত প্রধান বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলা হইতে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নবদ্বীপে একটী চতুষ্পাঠী করেন। একই সময়ে তাঁহার চতুষ্পাঠীতে চৈতন্য, রঘুনাথ ও রঘুনন্দন পাঠার্থী ছিলেন; পরে রীতিমত শিক্ষিত হইয়া এই তিন ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন—এই একই স্থান হইতে তিনটি ভিন্ন স্রোত প্রবাহিত হয়; একটী ধর্ম্মের স্রোত, অন্যটী ন্যায়ের স্রোত, ও অপরটী স্মৃতির স্রোত; এই তিন স্রোতে বঙ্গভূমি প্লাবিত হইল—সে জল আর শুকাইল না—তবে নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া এক্ষণে আর সে স্রোতের তেজ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই তিন স্রোতের আবর্ত্তনে সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষরূপে আলোড়িত হয়; সুতরাং সে সময়ে অনেকেই সংস্কৃতালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সেই আলোচনার ফল বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংস্কৃত গ্রন্থ; আবার চৈতন্য দেব নিজে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অতিশয় ভক্তি করিতেন সুতরাং তাঁহার শিষ্যগণ ইহার আলোচনা করিতেও নিরস্ত হন নাই; তাহারই ফল, রাগময় কণ, রসময় কলিকা, করচাই, চৈতন্য ভাগবৎ, চৈতন্য চরিতামৃত ও লোচনদাস প্রণীত চৈতন্য মঙ্গল ইত্যাদি। তবে এ সময়ের বাঙ্গালাভাষার বিশেষ রূপান্তর হয় নাই; স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইলেও যেন তেজোহীন।

চৈতন্য দেবের কাল অতিক্রম করিয়ে আমরা গোবিন্দদাসের কালে উপনীত হই; এই সময়ে আমরা নানা কবির দর্শন লাভ করিয়া থাকি। চৈতন্য দেবের সময় বা কিঞ্চিৎ পরেই চৈতন্য ভাগবৎ ও চরিতামৃত প্রণীত হয়; ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম গ্রহণ হইতে লীলা সম্বরণ পর্য্যন্ত সমুদায়

কার্য্যই আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইয়াছে; ইহা তাঁহার জীবন চরিত। চৈতন্য দেবের জীবিতাবস্থায় তিনি সাধারণ লোকের নিকট গৌরাঙ্গ অবতার বলিয়া প্রতিপাদিত হন নাই; তিনি সে সময়ে কৃষ্ণভক্তপ্রধান লোক বলিয়া পূজিত হইলেও সাধারণতঃ অবতার বলিয়া উপসেবিত হন নাই; কিন্তু গোবিন্দ-দাসের সময় তিনি অবতার বলিয়া অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণ তাৎ-কালিকী হিন্দুগণের শোচনীয় অবস্থা প্রশমিত করিবার জন্যই স্বয়ং চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া, লোকের কলুষিত চিত্ত পাপ বিমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি গোবিন্দদাস সাময়িক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; তখন তাঁহার সমুদায় কার্য্যেই দেবত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংসারের গতিই এইরূপ; পৃথিবীতে কোন অসাধারণ লোক জন্ম-গ্রহণ করিয়া, তাঁহার জীবিতাবস্থায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারেন নাই; জীবিতাবস্থায় তাঁহারা বাতুল বা এইরূপই কোন অভিধানে অভিহিত হইয়া থাকেন; চারি দিকেই তাঁহার শত্রু বিরাজমান; এই শত্রুর হস্তে কখন কখন প্রাণ বিসর্জ্জনেরও দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। সক্রেটিস এই জন্যই হত—যীশুখ্রীষ্টের এই জন্যই ক্রুসে প্রাণত্যাগ—গালিলিও এই জন্যই বলিয়াছিলেন "পৃথিবী তুই এখনও ঘুরিতেছিস্, ক্ষান্ত হ'; নহিলে আমি কিরূপে সত্যের অপলাপ করি।" বুদ্ধদেব জীবিতাবস্থায় সাধারণতঃ তিরস্কৃত; উইক্লিফ বা লুথরের জীবদ্দশার বৃত্তান্তও এই প্রকার—মহম্মদকে এই জন্যই জন্মস্থান হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে আমরা যে কোন ঐশ্বরিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের বিষয় আলোচনা করি না তাহাতেই এই সত্যটি দেখিতে পাইব; তবে অলৌকীক গুণ সম্পন্ন চৈতন্য দেব কেনই বা

না এরূপে বিড়ম্বিত হইবেন ? কিন্তু অন্যান্য মহাপুরুষগণ যে ভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তদ্দূর নহেন—অন্যান্য মহাপুরুষগণ যেমন জীবিতাবস্থাতে দেশের শত্রু ও অনেকের ঘৃণ্য হইয়াছিলেন চৈতন্যদেব তাহা হন নাই; তিনি যে সময়ে নিজের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকরূপে ছাত্রগণকে সকল শব্দেরই অর্থ হরি বলিয়া প্রতিপন্ন করতঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, সে সময়েও যেমন সকলের ভক্তির ধন—আর যে কালে কৌপীন করঙ্গ ধারণ করিয়া নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, দ্বারে-দ্বারে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন ও "প্রেম ধর ধর লওরে" বলিয়া সকলকে আহ্বান করিতেন তখনও তিনি সেইরূপ ভক্তির ধন। যাহা হউক তিনি সে সময়ে লোকের এতাদৃশ ভক্তির পাত্র হইলেও অবতার বলিয়া অভিহিত হন নাই; গোবিন্দদাসের সময়েই তিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং এই জন্যই এই সময়ের কবিগণ, যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণন করিয়াছেন সেই ভাবেই গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলাও বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের সময়ে বঙ্গদেশ বৈষ্ণবময়; শুধু বঙ্গদেশ কেন উৎকল, মগধ, বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা এই সকল স্থানেই তখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের তান উঠিয়াছে। দক্ষিণাঞ্চলে রামানন্দ যে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহাতে চৈতন্যের ভক্তি তরঙ্গ প্রবেশ করিয়াছে। চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যদ্বয় রূপ ও সনাতন, তাঁহার তিরোধানের পর বৃন্দাবন ও মথুরার অনেক গুপ্ততীর্থ আবিষ্কার করেন ও তথাকার লোককে চৈতন্যদেবের ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইয়া দেন; তদবধি তথায় চৈতন্যদেবের প্রাধান্য হই-

রাছে—এক্ষণেও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন। যাহা হউক গোবিন্দদাসের সময়ে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলেই চৈতন্য দেবের উপাসক; বিশেষতঃ প্রেমময়ী বঙ্গীয়া ললনাগণের তিনিই একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন; এক্ষণেও অধিকাংশ প্রাচীনা বঙ্গীয়া রমণী গৌরাঙ্গের উপাসনা করিয়া থাকেন। গোবিন্দদাস গৌরাঙ্গের একজন প্রধান ভক্ত থাকিলেও তাঁহার রচিত অধিকাংশ গীতই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা সংক্রান্ত; কিন্তু তাঁহার সম-সাময়িক প্রেমদাস—বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি কবিগণ অধিকাংশ চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা বর্ণন করিয়াছেন; তবে গোবিন্দদাস যে চৈতন্য লীলা বর্ণনা করিতে একেবারে নিরস্ত হইয়াছেন তাহা নহে—তাঁহারও গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন অনেক আছে; তিনি আচার্য্য সহ চৈতন্যের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক, এই সময়ে আমরা অনেক বৈষ্ণব কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি; রায় শেখর, রায় বসন্ত, নরোত্তম দাস, নরহরি দাস, বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, বৈষ্ণব দাস, যদুনন্দন, রামানন্দ বসু, প্রেমদাস, বাসুদেব ঘোষ, প্রসাদ দাস, ভীম দাস, গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণদাস, রসময় দাস, বংশীদাস, পীতাম্বর দাস, গোপাল দাস, বল্লভ দাস, সুখময়দাস, লোচন দাস, প্রভৃতি শত শত কবি জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সময়ে বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছেন; বাস্তবিক এই সময়ে আমরা যত বৈষ্ণব কবি দেখিতে পাই, এত আর কখনই নহে। আমরা উপরে যে সকল মহাজনের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই যে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী ছিলেন তাহা নহে, অনেকে তাঁহার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন।

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে গোবিন্দদাস কোন্ সময়ের লোক; ইহার অনুধাবনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনি ১৪৮৯ শকে বা ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে লোক লীলা সম্বরণ করেন তাহা হইলে আমরা উপরে যে সকল কবির নামোল্লেখ করিয়াছি তাঁহারা এই সময়ে বা তাহার কিছু পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুমধুর পদাবলীতে লোকের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছেন; আমরা প্রস্তাবান্তরে এই সকল কবির বিষয় আলোচনা করিব। যাহা হউক এই সময়ে বঙ্গ-দেশের লৌকিক অবস্থা অতীব রমণীয়; বঙ্গের যে স্থানে যাও সেই স্থানেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা—সেই স্থানেই প্রেমের লহরী-লীলা খেলিতেছে—সেই স্থানেই বৈষ্ণব কবিগণ কোমল-কান্ত-পদাবলীতে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন। তখন যেন সকলই প্রেমময়—সকলেরই হৃদয়ে প্রেমের উৎস স্ফুরিত হইতেছে। এই সময়টীই বৈষ্ণব ধর্ম্মের চরম কাল; ইহার পরই ক্রমিক অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণগণ হিন্দু-সমাজের প্রথম অবস্থা হইতে তাহার উপর একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছেন; মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট পরাজিত হইলেও পুনরায় আপনাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ করিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আবার ব্রাহ্মণের কৌশল জাল হইতে নিস্কৃতিলাভ করিল; তাহা ব্রাহ্মণগণের অসহনীয়; সুতরাং তাঁহারা এই ধর্ম্মের সূত্রপাত হইতেই ইহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণের নবীন উচ্ছ্বাসের সময় তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই;

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহারা পুনরায় আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন; বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামীগণ ব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য হইয়া গেলেন; সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম সেই অবধি এক সঙ্কীর্ণ পথে, মন্থর গতিতে গমন করিতেছে—আর সে তেজ নাই—সে উৎসাহ নাই, যেন নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময়ই তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব; বৈষ্ণব ধর্ম্ম তন্ত্রের আসুরিক ভাবের নিকট আপনার প্রেম ভাব অক্ষত রাখিতে পারিল না; সুতরাং এই সময় হইতেই আমরা বৈষ্ণব কবির সমধুর তান শ্রবণে বঞ্চিত হইলাম; তত্রাপি লোকের হৃদয় কন্দরে এক্ষণেও যে বৈষ্ণব কবিগণ বিরাজ করিতেছেন তাহা বলা বাহুল্য। অধুনা বঙ্গবাসী যে অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা গীতি কাব্যের অধিক প্রিয় তাহার কারণ, বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবির গীতি নিচয়ের স্মৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে; যতদিন বঙ্গভাষায় গীতি কাব্য রচিত হইবে—যতদিন বঙ্গবাসী গীতি কাব্যের অধিক আদর করিবেন, ততদিন বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণের মান্য কিছুতেই অন্তর্হিত হইতেছে না।

যাহা হউক, বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিবৃন্দ যে বঙ্গভাষার অনেক অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; তাঁহাদের যত্নবারি সিঞ্চিত না হইলে বঙ্গসাহিত্য অকালেই লয় প্রাপ্ত হইত; ইহা জন্ম গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব কবিগণেরই অঙ্কে লালিত ও পালিত হইয়াছে; তাঁহারাই ইহার শৈশব সংস্কার বিধান করিয়াছেন—এবং তাঁহাদের সোহাগ ও আদরেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া ইহা এক্ষণে সকলের নয়নাকর্ষণ করিতেছে। তাহাদের নিকট আমাদের ভাষা

বিশেষ ঋণে ঋণী। আমরা যে এক্ষণে আমাদের নিজের ভাষায় সকল প্রকার কথোপকথন করিতে পারিতেছি ইহা তাঁহাদেরই অনুগ্রহে; না হইলে আমাদের মাতৃভাষায় আমরা এক্ষণেও সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম কি না, কে বলিতে পারে? যখন বৈষ্ণব কবিকুল ইহার প্রতি অনুকূল নেত্রে সন্দর্শন করেন—তখনও মুসলমানগণ বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা; তাঁহাদের ভাষা বিভিন্ন; তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে হইলে উর্দ্দু বা পারসীর সাহায্য লইতে হইত—তখন সমুদায় বিচার কার্য্যই পারসী ভাষাতে সম্পাদিত হইত; সুতরাং সাধারণ লোকে তখন পারসী ভাষারই প্রতি অনুরক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়; আবার পণ্ডিতগণ সংস্কৃতের আলোচনা করিতেন; সুতরাং সে সময়ে কেবল বৈষ্ণব কবিগণই ইহার উপর সদয় ছিলেন—এবং তাঁহাদের এই সদয় ব্যবহারের জন্যই বাঙ্গালাভাষা আজিও জীবিতা রহিয়াছে ও দৈনন্দিন ইহার কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল করিতেছে। বৈষ্ণবগণের অধঃপতন, রাজ-বিপ্লবের সময়েই সংঘটিত হয়। যে সময়ে বঙ্গরাজ্য লইয়া মোগল পাঠানে বিবাদ, সেই বিবাদের সময়েই বঙ্গ সমাজে ধর্ম্ম বিপ্লবও ঘটিয়া উঠে; আবার তাহার কিছুদিন পরেই বঙ্গদেশ পুনরায় ব্রাহ্মণের কৌশলে জড়ীভূত হইয়া পড়েন; সেই সময়েই বৈষ্ণব কবিগণ সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; সুতরাং আমরাও এইস্থলে বৈষ্ণব কবিগণকে বিদায় দিয়া নূতন কালে উপনীত হইতেছি। কিন্তু ইহাদিগকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে এই সময়ে দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল একবার দেখিতে হইতেছে। মুসলমানগণ সমুদায় ভারতের অধীশ্বর; দিল্লীতে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট

আসীন; বঙ্গদেশে মোগল ও পাঠান উভয়েই জয়শ্রী পাইবার নিমিত্ত লালায়িত; কখন বা মোগল জয়ী—কখন বা পাঠান জয়ী; সুতরাং তখন কেহই নির্ব্বিবাদে স্বীয় আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। পাঠান অধিকৃত সময়ে বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছিল; পাঠানরাজ বঙ্গীয় জায়গীরদারগণকে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজা করিয়াছিলেন; ইঁহারা সকলেই আপনাপন আবশ্যক মত সৈন্য রাখিতে পারিতেন এবং সুবিধা হইলে ইহাদের মধ্যে কেহ প্রবল হইয়া অন্য জায়গীরদারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেন; এবং কখন কখন দিল্লীশ্বরের প্রাধান্যও অস্বীকার করিতেন। এই জমিদারগণের সৈন্যবল নিতান্ত কম ছিল না; আইন আকবরীতে লিখিত আছে যে, সুবা বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদার কায়স্থ; এবং তাঁহারা যুদ্ধকালে ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী,৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৭০ হস্তী, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকেন (৬)। এতদ্দৃষ্টে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বঙ্গীয় জমিদারগণ নিতান্ত সামান্য ছিলেন না। এই সময়েই বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিক (বার ভুঞা) গণ রাজত্ব করিতেন। পশ্চিম বাঙ্গালায় বিষ্ণুপুরাধিপতি; উত্তর বাঙ্গালায় কুচবিহারাধিপতি; পূর্ব্ববাঙ্গালায় ত্রিপুরাধিপতিগণ এ সময়েও আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন; প্রধান প্রধান জমিদার ছাড়িয়া দিলে, ক্ষুদ্র

(৬) "The zemindars (who are mostly Kiots) furnish also 23,330 cavalry, 801,158 infantry, 170 elephants, 4260 cannon and 4400 boats."

Gladwin's Ain Akbari Vol, II.

ক্ষুদ্র জমিদারগণও বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন, ও অনেক লস্কর, পাইক রাখিতেন বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং দাঙ্গা, হাঙ্গামা তখন নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের মত ছিল। এই ভয়ানক সময়ে যে, দেশের সাধারণ প্রজাবর্গ বিশেষ রূপে প্রপীড়িত হইতেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সে সময়ে দেশময় এক প্রকার অরাজকতা প্রশ্রয় পাইয়াছিল। কোন বলবান্ প্রজা কোন দুর্ব্বল প্রতিবেশীর সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইলে তাহার বিচার করে কে? আবার তখন রাজকর্ম্মচারীগণের পীড়ন অত্যধিক ছিল। যখন সম্রাট কুলতিলক আকবর সাহের সুশাসন কালে, ও সদাশয় মহারাজ মানসিংহের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়াও বর্দ্ধমান প্রদেশ মামুদ সরিফের ন্যায় দুর্দান্ত কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, তখন আর অন্য সময়ের কথার প্রয়োজন কি? তখন অন্য সময়ে প্রজাগণ যে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা পাইতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তখন হিন্দু প্রজার উপর জিজিয়া কর গ্রহণ করা হইত—তাঁহাদের জমির আঠার কাঠায় বিঘা ধরা হইত—তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর বা দেবোত্তর জমি জমাই বলিয়া গণ্য করা হইত, এইরূপ অত্যাচারের শত শত দৃষ্টান্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে আমাদের স্মৃতিপটে সমুদিত হয়। যখন আকবর সাহের সুশাসন কালেও রাজকর্ম্মচারীর দৌরাত্ম্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ কবিকঙ্কণ সাত পুরুষের বাস্তু ভিটা ও স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন আর অন্য সময়ের কথায় কাজ কি? হিন্দুগণের বাস্তু ভিটার প্রতি যে কিরূপ মমতা, তাহা সকলেই অবগত আছেন; হিন্দুগণ উদর জ্বালায় সমুদায় বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু সাত পুরুষের বাস্তু ভিটাটি ত্যাগ করিতে পারেন না; কোন হিন্দু

সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া দূরতর দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেও, অন্যের অজ্ঞাতসারে আপনার সাত পুরুষের ভিট্টাটি একবার দেখিতে আইসে; না হইলে তাঁহার সন্ন্যাস ধর্ম্মে পুণ্যোপার্জ্জন হয় না ইহাই বিশ্বাস। যে জাতির পৈতৃক বাস্তু ভিট্টার প্রতি এতাধিক মমতা, সেই হিন্দুই যখন (যৎকালে তাহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া এখনকার মত কুসংস্কারচ্যুত হয় নাই) অক্লেশে বাস্তু ভিট্টা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, তখন যে বঙ্গবাসী তৎকালে কি অসহ্য যন্ত্রণা পাইতে ছিলেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। যৎকালে তাঁহারা এইরূপে পীড়িত তখন তাঁহাদের মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে কোথা হইতে? তখন তাঁহাদের মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ হ্রাস হওয়াই সম্ভবপর। দারিদ্র্য দশায় কবির শক্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তিমতী হইতে পারে না; ঘটকর্পরের "দারিদ্র্য দোষো গুণ রাশি নাশী" বা কালিদাসের "কাতরে কবিতা কুতঃ" কথা গুলি স্মরণ হয়; কাতর অবস্থায় কবির শক্তি পূর্ণ বিকাশ পায় না; কবি যখন আপনার দুঃখেই ব্যতিব্যস্ত, তখন তিনি অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করিবেন কি প্রকারে? আমাদের শাস্ত্রে বলে "পৃথিবীতে নর জন্ম দুর্লভ, তাহাতে বিদ্যালাভ করা আরও দুর্লভ, আবার তাহাতে কবিত্ব প্রাপ্ত হওয়া অতীব দুর্লভ, আবার কবিত্ব লাভ হইলেও তাহাতে শক্তি থাকা নিতান্ত দুলভ।" কবিত্ব শক্তি যখন এতাদৃশ দুর্লভ বস্তু, তখন তাহা পীড়িত দশায় পাওয়া যাইতে পারে কি? কিন্তু বঙ্গদেশের এমন দুঃসময়েও আমরা দুই জন প্রকৃত কবির দর্শন লাভ করিয়া থাকি; প্রথম, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও দ্বিতীয় কৃত্তিবাস পণ্ডিত। একজন স্বকপোল-কল্পিত কাব্য লেখক, অন্যজন

ভগবান্ বাল্মিকীর প্রিয় সেবক ও অনুবাদক। উভয়েই মহাকবি; কিন্তু সমাজের দোষে তাঁহাদের কাব্য প্রকৃত মহাকাব্য হইতে পারে নাই। তাঁহারা যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ের চিত্র এক প্রকার দেখাইয়াছি সুতরাং সেই কুসময়ে—সেই বঙ্গবাসীর নিগ্রহ সময়ে—সেই নিস্তেজ অবস্থায় তাঁহাদের কাব্য বীর-রস পাইবে কোথা হইতে? সুতরাং তাঁহারা যেখানে বীর রসের অবতারণা করিতে গিয়াছেন সেই স্থানেই কেবল কতকগুলি শব্দের অবতারণা করিয়াছেন মাত্র—সে বর্ণন শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় না—নিশ্বাসে অগ্নিকণা বহির্গত হয় না—হৃদয় স্তব্ধীভূত হয় না—মনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না; যেন কি পড়িলাম—কি শুনিলাম; বাস্তবিকই এই স্থলে তাঁহাদের প্রকৃত শক্তি তিষ্ঠিতে পারে নাই। তত্রাপি তাঁহারা যে অদ্বিতীয় কবি ছিলেন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সময়ে ইহারা দুইজন ব্যতীত গীতি কাব্য প্রণেতা দুই চারিজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন; কিন্তু আমরা কার্য্য সৌকর্য্যার্থে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাদের প্রত্যেকের নামোল্লেখ না করিয়া, তাঁহাদিগকে এক সমাজ স্থিত বলিয়া গোবিন্দদাসের কালে ধরিয়া লইয়াছি; এক্ষণে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া আমরা নূতন কালে সমুপস্থিত হইতেছি।

বৈষ্ণব কবিগণের সময় পরিত্যাগ করিলে আমরা কবিকঙ্কণের কালে সমুপস্থিত হই; অনেকে বলেন কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা এখনও স্থিরচিত্ত হইতে পারি নাই; তাহার কারণ পরে প্রদর্শিত হইবে। তবে যখন কবিকঙ্কণকে কৃত্তিবাস পণ্ডিতের পরবর্ত্তী বলিয়া অনেকের মনে ধারণা আছে, তখন আমরা কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসকে

সম-সাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। আমরা এই স্থলে কবি-কঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের কথা বলিবার অগ্রে আর এক সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। বৈষ্ণব কবিগণের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে কথকতার সৃষ্টি হয়; বৈষ্ণব কবিগণ যাহা রচনা করিতেন তাহা পণ্ডিতগণের আলোচ্য, কিন্তু কথকতা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই হৃদয়াকর্ষক; কবিগণের মধুময়ী কবিতানিবহ সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান সহায় ও পণ্ডিতগণেরই বোধ্য—কথকতার সুন্দর রাগ-রাগিণী সংযুক্ত মধুর কথা ও গীত, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই সমান আদরের ধন; সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় পণ্ডিতগণের জন্য যেমন সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি, তেমনই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার হৃদয়াকর্ষণের নিমিত্ত কথকতার উৎপত্তি। বৈষ্ণবকবি তখন প্রায় বঙ্গদেশের সকল স্থলেই বিরাজিত ছিলেন—এদিকে মনোহর পদবিন্যাসী মধুর গায়ক কথক-বৃন্দও তখন বোধ হয় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রভা বিকীর্ণ করিতেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি মহাজনের মোহন কবিতা নিচয় যেমন সঙ্কীর্ত্তনের প্রধান অবলম্বন—ভক্তি রসাপ্লুত শ্রীমদ্ভাগবৎ সেইরূপ কথকগণের প্রধান সাধন; কথকতার সৃষ্টি কিরূপে কখন হয় তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রণীত "সেই এক দিন, আর এই এক দিন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী গ্রাম নিবাসী গঙ্গাধর শিরোমণি একজন উত্তম গায়ক ও ভাগবৎ ব্যাখ্যাতা ছিলেন—তিনি নানা স্থানে শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতেন ও যেখানে যাইতেন সেই খানেই তাঁহার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত; একদা

কোন স্থানে তিনি এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা করিতে-ছেন কিন্তু সে দিন তথায় অধিক লোকের সমাগম হয় নাই; ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, নিকটেই কোন এক স্থানে রামায়ণ গান হইতেছে; লোক সকল সেই স্থানেই যাইতেছে। গঙ্গাধর নিজে একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন; তিনি তাঁহার ব্যাখ্যা অপেক্ষা গানের চিত্তাকর্ষণী শক্তি অধিক বুঝিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন, আগামী কল্য হইতে আমার নিকট শ্রীমদ্ভাগবৎ গান শুনিতে পাইবে। এই কথা বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পরদিনের ব্যাখ্যেয় স্থল, স্বকপোল-কল্পিত কথকতায় পরিণত করিলেন। পরদিন যথা-সময়ে বেদীতে উপবেশন পূর্ব্বক তান-লয় স্বরে ভাগবৎ গান আরম্ভ করিলেন; চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপে তিনি ধ্রুব চরিত্র, প্রহ্লাদ চরিত্র, বামন ভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল কথকতায় পরিণত করিয়া নূতন ভাবের গীত আরম্ভ করিলেন; ক্রমশঃ রামায়ণ—মহাভারত পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইল (৭) কথকতার কতকগুলি বর্ণনা বেশ প্রীতিপ্রদ; প্রভাত বর্ণনা, মধ্যাহ্ন বর্ণনা—সায়াহ্ন বর্ণনা—যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি বর্ণনা গুলি অতিশয় চিত্ত-হারিণী; গঙ্গাধর শিরোমণি কতদিনের লোক তাহা আমরা বলিতে পারি না এবং তিনিই এইরূপে কথকতার সৃষ্টি করেন কি না সে বিষয়েও আমরা কোন কথা বলিতে পারি না, তবে এইমাত্র বলি, কথকতার রীতি যে বহু প্রাচীন

৭। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" ৬৩ পৃষ্ঠা।